জানবার কথা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

[illegible]

১১-বি, চৌরঙ্গি টেরাস, কলকাতা ২০

।। উৎসর্গ ।।

যারা দুনিয়াকে জেনে দুনিয়াকে বদলাবে
যারা আলো জ্বেলে অন্ধকার তাড়াবে
নতুন ভবিষ্যৎ যারা মুঠোয় আনবে
আমাদের দেশের সেই ছোটো ছোটো
ছেলেমেয়েদের
উদ্দেশে
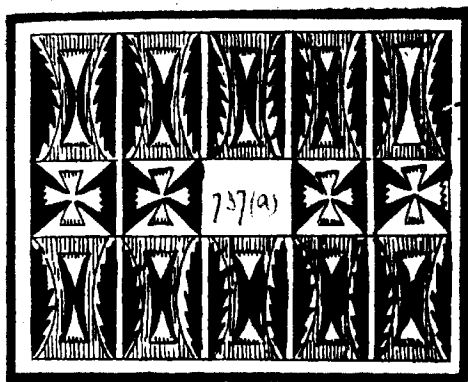
জা ন বা র ক থা

'জানবার কথা' কেন ?

কেননা, মনের স্বাভাবিক কৌতূহলের কথা ছাড়াও, জানা-না-জানার সঙ্গে আজ বাঁচা-মরার সম্পর্ক বড়ো নিকট হয়েছে। এমনটা বোধহয় বিশ বছর আগেও ছিলো না।

বিকিনি দ্বীপ কোথায়? বিকিনি দ্বীপ কতো দূরে? ঠাকুর্দারা কোনোদিন এ-প্রশ্ন তোলেন নি, অন্তত প্রশ্নটা তোলবার বিশেষ কোনো তাগিদ বোধ করেন নি।

আজ কিন্তু অন্য রকম। কাগজে দেখি, বিকিনি দ্বীপে হাইড্রোজেন বোমা ফেটেছে। দিন কতক যেতে না যেতেই শুনি, তারই তেজে জাপানী জেলেদের শরীর পুড়ে খাক হয়ে গেলো।

তারপর দেখি, আমাদের বৈজ্ঞানিকেরাও উড়োজাহাজের পাখনা পরীক্ষা করে দেখছেন, ওই বোমার ছাই আমাদের আকাশেও উড়ে এসেছে কি না। কী সর্বনেশে সেই ছাই!

অগত্যা শুধোতে হলো, বিকিনি দ্বীপ কোথায়? কতো দূর?

প্রশ্নটা না তুলেও সে কালের লোক নিরাপদে বাঁচতে পারতো।

আমরা পারলাম না।

শুধোলাম, হাইড্রোজেন মানে? শুনলাম, হাতিঘোড়া কিছু নয়। এক রকমের গ্যাস। বেলুনে ভরে দিলে বেলুনটা হুসহুস করে আকাশে উড়ে যায়, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা তাই দেখে হাততালি দিয়ে ওঠে। খেলা।

হাইড্রোজেনের বোমাটা কিন্তু খেলা নয়। কী তেজ! পৃথিবীকে বুঝি ভস্ম করে দেবে!

কে যেন হিসেব করে বলছিলেন, ওই রকম পাঁচ-সাতটা বোমা পৃথিবীর পাঁচ-সাত জায়গায় তাক করে ফেলতে পারলেই....

কী হবে? কী হবে?

পৃথিবীর বুকে সবুজের সবটুকু চিহ্ন এক মুহূর্তে পুড়ে খাক হয়ে যাবে।

ছাই হয়ে যাবে সমস্ত পশু। সমস্ত পাখি।

নিশ্চিহ্ন হবে মানুষ। মানুষের সমস্ত কীর্তি।

হাইড্রোজেন দিয়ে কী করে বোমা তৈরি করে তা জানবার কৌতূহল হয়েছিলো। কিন্তু সে-বোমার এই তেজের কথা

শুনতে শুনতে কৌতূহলকে ঠেলে মনে জাগলো আর একরকম প্রশ্ন : সত্যিই কি পৃথিবীতে আর কোনোদিন ফুল ফুটবে না? পাখি ডাকবে না? পুড়ে খাক হয়ে যাবে যেখানে যতো মানুষ?

• সুন্দর পৃথিবী! তারই বুকে মানুষ তিলেতিলে গড়ে তুলেছে কতো অপরূপ কীর্তি! আর সেই পৃথিবীই কিনা একটা বোবা ছাইএর দলা হয়ে অন্ধের মতো আকাশে ঘুরপাক খাবে?

সবটাই কিন্তু মানুষের হাতে। মানুষই আজ পৃথিবীর চরম ভাগ্যবিধাতা। মানুষের ভাগ্যবিধাতাও!

হাইড্রোজেন বোমা। মানুষ কী করবে এই বোমা দিয়ে?

একদল বললো, লড়াই করতে হবে।

কিন্তু আবার যুদ্ধ কেন? এই সেদিনকার অমন বিভীষিকার কথা কি মানুষ এতো তাড়াতাড়ি ভুলে গেলো? কতো মানুষ মরেছিলো? কতো শিশু? কতো বৃদ্ধ? কতো নারী?

আর, তার আগের বার? প্রথম মহাযুদ্ধে?

কে যেন বললো, কপাল! বিধির বিধান! উপায় নেই।

কথাটা কি ঠিক? একজন বললো, ঠিক নয়। উপায় আছে। সে উপায় মানুষেরই হাতে।

কে যেন বললো, আসলে ও-সব কিছু নয়। আসল কথা হলো, মানুষের স্বভাবটাই ওই রকম। খুনের নেশা তার মজ্জায়-মজ্জায়। মাঝে মাঝে রক্তে নেয়ে উঠে তবেই তার সুখ। তাই...........উপায় নেই!

কথাগুলো কি ঠিক? আর একজন বললো, মিথ্যে কথা। যারা যুদ্ধ বাধাতে চায় তারা এই মিথ্যে রটিয়ে বেড়াচ্ছে। মানুষ হিংস্র জানোয়ারের মতো নয়। মানুষ ভালোবাসে মানুষকে।

কে যেন বললো, এ-সব নিয়ে তর্ক করে কী হবে? আসল হিসেবটা মনে রাখা দরকার। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যে-রকম হুহু করে বাড়ছে তাতে দুদিন পরে মানুষগুলো অনাহারে মরবে। পৃথিবীতে খাবারের জোগান তো আর অফুরন্ত নয়। তাই ভালোই তো। যুদ্ধ হয়ে মাঝে মাঝে কিছু ফালতু মানুষ সাফ হয়ে যাওয়াই ভালো।

কথাগুলো কি ঠিক? আর একজন বললো, মিথ্যে কথা। পৃথিবীতে খাবারের যা জোগান আছে, অফুরন্ত নতুন নতুন খাবার তৈরি করবার যে-সব কৌশল মানুষ আবিষ্কার করেছে, সেগুলোর হিসেব দেখলেই বুঝতে পারা যাবে খাবার নিয়ে টানাটানি কোনোদিনই পড়বে না।

তবে, এমন বীভৎস যুদ্ধের আয়োজন কেন? একজন বললো, তার স্পষ্ট কারণ আছে।

দুই আর দুই-এ মিলে যে-রকম চার হয় সেই রকমই স্পষ্ট।

কারণটাকে জানতে হবে। তার প্রতিকার করা যায়। তার প্রতিকার করতে পারবো। শান্তিতে নিটোল করে তুলবো সুন্দর সুস্থ পৃথিবী।

যেন বাঁচবার একটা অবলম্বন পাওয়া গেলো। শুধোলাম, কী সেই কারণ? প্রতিকারটাই বা কী?

সে অনেক কথা। ঠিকমতো ঠাহর করতে হলে অনেক কথাই জানতে হবে।

বিজ্ঞান।

ইতিহাস।

দর্শন।

অর্থনীতি।

রাজনীতি।

আবার সেই জানবার কথাই। জানবার কথাতেই ফিরে আসতে হলো বাঁচবার আশায় এগিয়ে।

জানবার কথা শিখতে তো ছেলেমেয়েরা ইস্কুল যাচ্ছে। তাহলে আবার এ-রকম দশখানা বই কেন ?

শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা রকম মৌলিক সমস্যার অবতারণা করা চলতো। কিন্তু আপাতত তার জায়গা নেই। দরকারও নেই। কেননা, তার চেয়ে ঢের সাদামাটা একটা জবাব রয়েছে।

ইস্কুলের বই ছাড়াও ইস্কুলের ছেলেমেয়েরাই আরো কিছু কিছু বই পড়তে চায়। পড়েও। ইস্কুলেও পড়ে, অন্য বইও পড়ে। অনেক কথা জানে ইস্কুলের আঙিনার বাইরে।

ইস্কুলের আঙিনার বাইরেই আমরাও ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসর জমাতে চেয়েছি। যে-সব কথার আলোচনা তুলেছি তা বোঝা-না-বোঝার সঙ্গে পাস-ফেল করবার সম্পর্ক নেই। ওরা তাই সহজ হয়ে শুনছে, আমরাও সহজ করে বলছি। হয়তো ইস্কুলে যে-কথা একবার শোনা হয়েছে আমাদের আসরে

সেই কথাই আবার উঠলো তবু আলোচনাটা হলো নতুনভাবে। হয়তো আবার এমন কথাও উঠলো যা ইস্কুলে তোলা হয় না।

আমাদের এই জানবার কথার আসরে কোন কথা তুলছি? কোন কথা তুলছি নে? সমস্ত কথাই তো আর পাড়া যায় না। বাছাই করতে হয়। বাছাই করতে গেলে একটা কোনো পরিকল্পনা মাথায় রাখা চাই।

আমাদের পরিকল্পনাটা কী রকম?

শুরুতেই তো সেই কথা পেড়েছিলাম। আমাদের কাছে জানবার কথা শুধুই কৌতূহল মেটানো নয়। জানা-না-জানার সঙ্গে বাঁচা-মরার সম্পর্ক।

এই কথাটাই ঘুরিয়ে বললে বলতে পারি: আমাদের আসরে সবটুকু আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। মানুষের অতীত, মানুষের ভবিষ্যৎ।

বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা তুলেছি। জানতাম, বিজ্ঞানের সব কথা আলোচনা করবার সুযোগ হবে না। ষোলো শো পাতা ফুরোতে না ফুরোতে আমাদের পাত্‌তাড়ি গুটোতে হবে। এদিকে বিজ্ঞান ছাড়াও আরো অনেক বিষয়ের আলোচনা বাকি। তাই, বাছাই করতে হলো: বিজ্ঞান সম্বন্ধে ঠিক কতোটুকু কথা পাড়বো? যে-টুকু না বুঝলে দুনিয়ায় মানুষ কী করে এলো -তাই বোঝা হয় না। সেখানেই ফুরোলো আমাদের প্রথম খণ্ড।

দুনিয়ার কথা বলা হলো। বলা হলো, এই দুনিয়ায় মানুষ এলো কেমন করে। তারপর?

তারপর চললো মানুষের গল্পই। কোথা থেকে মানুষ যাত্রা শুরু করেছিলো? কোথায় এসে পৌঁছেছে? অর্থাৎ কিনা, ইতিহাস। কিন্তু আমাদের আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করেই, তাই ইস্কুলের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের আলোচনার কিছুটা তফাত হয়ে গেলো। ইস্কুলে পড়বার সময় ওরা অনেক রাজারাজড়ার গল্প শুনে এসেছে। আমাদের আসরে কিন্তু ইতিহাস বলতে শুধু রাজারাজড়ার যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনীই নয়। তার বদলে আমরা শুধোলাম, মানুষ এগুলো কী করে? দেখলাম, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে-করতে। মানুষ পৃথিবীকে যতোখানি বশ করতে পেরেছে ততোটাই জুটেছে তার বাঁচবার খোরাক। আবার বাঁচবার খোরাক জোটানোয় রদবদল হওয়ার দরুনই নানান ব্যাপার ঘটে গেলো: একটা যুগ বদলে আর-একটা যুগ, মানুষে-মানুষে এক-রকম সম্পর্ক বদলে আর-এক-রকম সম্পর্ক, মানুষের মাথায় এক-রকম ধ্যানধারণার বদলে আর এক-রকম ধ্যানধারণা। ইতিহাসের আলোচনা শেষ করতে করতে আরো দুটো বই ফুরিয়ে গেলো: আমাদের জানবার কথার দ্বিতীয় আর তৃতীয় খণ্ড।

কিন্তু মানুষের এই ইতিহাসটাকে জানতে গিয়ে দেখি আরো নানান সমস্যা উঠছে। তাগিদ পড়লো সেগুলোকে বোঝবার। প্রথমত, মানুষ যে পৃথিবীকে বশ করেছে তার কায়দাকানুনগুলো কী রকম? সে কথা বলতেই আরো দুটো বই লাগলো: আমাদের চতুর্থ আর পঞ্চম খণ্ড। আমরা দেখলাম, মানুষ কী করে ক্ষুধাকে জয় করেছে, যমরাজকে হারিয়ে দিয়েছে,

জয় করেছে পৃথিবীর নানান শক্তি, নানান ধরনের বস্তু। আকাশ জয় করেছে। বাতাস জয় করেছে। কী করে?

কিন্তু প্রকৃতিকে এতোখানি জয় করতে শিখেও, এমন অগাধ সম্পদের অধিকারী হয়েও, মানুষ কি সুখী হতে পেরেছে? পৃথিবীর সব মানুষ তো দুবেলা পেট ভরে খেতেই পায় না। পরনের কাপড় নেই, শিক্ষার সুযোগ নেই, স্বাস্থ্যের উপকরণ নেই। এ-নিয়ে আলোচনা করতে হলে অর্থনীতির কথা পাড়তে হয়, পাড়তে হয় রাজনীতির কথা। আমরাও সেই কথা পাড়বো বলেই এগুলাম। কিন্তু এগুতে গিয়ে দেখি নানা মুনির নানা মত। মতামতগুলো নিয়ে আলোচনার আগে পৃথিবী সম্বন্ধে ধারণাটা স্পষ্ট হওয়া দরকার, দরকার দেশবিদেশের তথ্য জোগাড় করা। সেই চেষ্টায় লেগে গেলো একটা পুরো বই: আমাদের ষষ্ঠ বই। তারপর, সপ্তম খণ্ডে রাজনীতির আলোচনা হলো, অর্থনীতির আলোচনা হলো, আর সেই সঙ্গেই আমরা আলোচনা করে নিলাম আর একটা বিষয়। দিনের পর দিন খবরের কাগজে পৃথিবীর এতো যে খবর ছাপা হয় তা বুঝতে হলে কতকগুলো কথার মানে স্পষ্ট হওয়া দরকার। ইউ.এন্.ও. কাকে বলে? অতলান্তিক চুক্তি মানে কী? এই রকম, নানান রকম।

কিন্তু এইখানেই আমাদের আসর শেষ হলো না। কেননা, জানবার কথা তখনো অনেক বাকি।

মানুষ সুন্দরকে সৃষ্টি করেছে। সাহিত্য। চারুশিল্প। সে-কথা বলতে গিয়ে দু'দুখানা বই লাগলো। অষ্টম আর নবম বই।

যুগের পর যুগ ধরে মানুষ সত্যকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা

করেছে। এরই নাম দর্শন। আমাদের দশম বই তাই দর্শন নিয়ে।

তাহলে, একবার আগাগোড়া ভেবে নেওয়া যাক। কোন কোন খণ্ডে কী কী কথা আলোচনা করা হয়েছে?

॥ এক ॥ বিজ্ঞান।
॥ দুই ॥ ইতিহাস।
॥ তিন ॥ ইতিহাস।
॥ চার ॥ যন্ত্রকৌশলের কথা।
॥ পাঁচ ॥ যন্ত্রকৌশলের কথা।
॥ ছয় ॥ পৃথিবীর খবর।
॥ সাত ॥ অর্থনীতি আর রাজনীতি।
॥ আট ॥ সাহিত্য।
॥ নয় ॥ চারুশিল্প।
॥ দশ ॥ দর্শন।

জানবার কথা যা-কিছু তার সবই কি আলোচনা করা হলো? নিশ্চয়ই নয়। সমস্ত কথা বলতে গেলে তো রাশি-রাশি বই লিখেও ফুলোবে না। তবুও আগাগোড়া আমরা অন্তত একটা দিকে খেয়াল রেখেছি।

সাধারণত আমরা যখন কিছু পড়ি বা শিখি তখন বিষয়টাকে আলাদাভাবে বোঝবার চেষ্টা করি। এক বিষয়ের সঙ্গে আর এক বিষয়ের সম্পর্কটা ঠিক কী ধরনের সে-কথায় তেমন হুঁশ থাকে না। অথচ হুঁশ থাকা দরকার। কেননা দুনিয়ায় সব-কিছুর সঙ্গে বাকি সব-কিছুর গভীর সম্পর্ক। তাই জানবার

সময় এই সম্পর্কগুলোকেও চেনা দরকার। অর্থাৎ কিনা, আমাদের কাছে প্রত্যেক বিষয়ের সঙ্গে বাকি বিষয়গুলির যোগাযোগ আছে। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি, ইতিহাস—জ্ঞানের কতকগুলো আলাদা-আলাদা কুঠরির মতো নয়। তার বদলে একই দেহের নানান অঙ্গের মতো।

আমাদের জানবার আসরে শুরু থেকে একটা খুব সুবিধে ছিলো। গোড়া থেকেই ঠিক ছিলো আগাগোড়া আলোচনাটা হবে মানুষকে ঘিরে, মানুষকে কেন্দ্র করে। আর তাই সেই দিক থেকে এ-বিষয়ের সঙ্গে ও-বিষয়ের সম্পর্কর কথাও এলো স্বাভাবিক ভাবেই। যে-মানুষ ছবি আঁকছে সেই মানুষই খেয়ে-পরে বাঁচতে চাইছে। খেয়ে-পরে বাঁচাটা অর্থনীতির সমস্যা, ছবি আঁকাটা চারুশিল্পের। একই মানুষের দুমুখো চেষ্টা—দুয়ের মধ্যে তাই একটা সম্পর্কও থাকতে বাধ্য। সেই সম্পর্কর কথা মনে না রাখলে কল্পনা করতে হয় যে-লোকটি ছবি আঁকছে সে বুঝি হাওয়া খেয়ে বেঁচে আছে। তা তো সত্যিই সম্ভব নয়। কথাটা সহজ। তবুও সব সময় মনে থাকে না।

আমাদের পক্ষে কিন্তু এই কথাটি মনে রাখবার একটা সুবিধে ছিলো। আগাগোড়াই আমাদের মাথায় ছিলো মানুষের কথা, পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের কথা। মানুষ যদি পৃথিবীকে বশ করে বাঁচবার সমস্যাটার সমাধান করতে না পারতো তাহলে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান—কিছুই সম্ভব হতো না। তাই বাঁচবার খোরাক জোটাতে পারাই হলো আসল ভিত্তি, তারই ওপর গড়ে উঠেছে মানুষের নানা রকম সৃষ্টি।

আর এইভাবে ভাববার চেষ্টা করেছি বলেই আমাদের চোখে মানুষের নানামুখী সৃষ্টির কোনোটাই খাপছাড়া নয়, একের সঙ্গে আর-একের সম্পর্কটা স্পষ্ট।

আরো একটা সুবিধে হলো। শুনতে প্রথমটায় অদ্ভুত ঠেকতে পারে। আমরা এই কজনে মিলে এই কখানা বই লিখলাম, তাও কিন্তু আলাদা-আলাদাভাবে নয়। একসঙ্গে মিলেমিশে চেষ্টা করে। তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে সবাই মিলে একই কলম ধরে একসঙ্গে কাগজের ওপর আঁচড় কেটেছি। কাজটা ভাগাভাগি করেই করা গিয়েছে। কিন্তু ভাগাভাগি করবার আগে সবাই মিলে একসঙ্গে বসে আলোচনা করেছি, পুরো পরিকল্পনাটি ভেবে নিয়েছি। তাই যে-কেউ যে-কোনো ভাগ লিখি না কেন, প্রত্যেকের মাথাতেই ছিলো একই পরিকল্পনা। তারপর, লেখবার পরও, আবার এক সঙ্গে মিলে ঘষা-মাজা করেছি : আমাদের মধ্যে যাঁর ভাষায় দখল বেশি তিনি অন্যদের লেখায় ভাষার তদারক করেছেন, বিজ্ঞানে যাঁর দখল বেশি তিনি অন্যদের লেখায় বৈজ্ঞানিক তথ্যের তদারক করেছেন। এই রকম। নানান দিক থেকে নানান ভাবে আমরা সবাই একসঙ্গে হাত মিলিয়ে দশখানা বই লিখলাম। তাই লেখক হিসেবে দশখানা বইএর ওপরই সবাইকার নাম একসঙ্গে বসিয়ে দেওয়া গেলো।

'জানবার কথা' যখন হাতে এলো তখন আমাদের সে কী ফুর্তি! শুরু করেছিলাম মাত্র মাস তিনেকের সময় নিয়ে। লেখা,

ছবি, ব্লক, ছাপা, বাঁধাই—সব কিছুই তার মধ্যে। এক-আধটা বই নয়, দশ-দশটা বই। যাঁরা আমাদের খুব ভালোবাসেন তাঁরাও শুনে হেসেছিলেন। আর, সত্যি বলতে কি, আমাদের নিজেদের মনেও সংশয় ছিলো : পারবো তো ?

আমরা বলাবলি করতাম, আকাশটাকে লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়া যাক। অন্তত গাছের ডগা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে।

অথচ বই হাতে এলো। হিসেবের সময়ের মধ্যেই। দশ দশটা বইই।

খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠবো না ?

কিন্তু আমাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে মাতব্বর তিনি বাকি সবাইকে বললেন : রোসো রোসো। এখনো আমাদের কাজ ফুরোয় নি।

আবার কী কাজ ? তিনমাস ধরে ঘাড় গুঁজে গাধার মতো খেটেছি—আরো কী করতে হবে ?

ভেবে দেখতে হবে। তিনি বললেন। অনেক কথা ভাববার আছে।

ছোটোদের শেখাবো বলে আমরা দশটা বই বাঁধলাম। কিন্তু নিজেরা কী শিখলাম ? কী শিক্ষা পেলাম ?

হুঁ। ভাববার কথা বই কি।

প্রথমত, এতো কম সময়ে এতোখানি করে ওঠা সম্ভব হলো কী করে ? আমার ওপর যতোখানি দায়িত্ব ছিলো তা যদি আমি একা চেষ্টা করতাম তাহলে কি পেরে উঠতাম ?

অথচ পেরেছি তো। কী করে পেরেছি ?

কারণ আমি একা-একা চেষ্টা করিনি। দশজনে মিলে এক-হয়ে একসঙ্গে ভেবেছি, একসঙ্গে চেষ্টা করেছি। আর তাই দশজনের প্রত্যেকেই বাকি সকলের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে রীতিমতো মেতে উঠতে পেরেছি, শুধু নিজে হলে যতোটুকু পারতাম তার চেয়ে ঢের বেশি পেরেছি। দশের চেষ্টা একের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছে,—এক আর একা নয়।

এ-বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার। এর নাম যৌথ চেষ্টা। মানুষের মধ্যে যে-সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে এই যৌথ চেষ্টাই সে-সম্ভাবনাকে টেনে বের করে। একজন যে কতোখানি পারে তা দেখে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়।

তাহলে, শেখাতে গিয়ে জরুরী কথা শিখলাম।

॥ এক ॥ যৌথ কাজ।

আর কিছু শিখি নি? শিখেছি।

যতোদিন শুধু নিজে নিজে কিছু করবার চেষ্টা করেছি ততোদিন শুধু নিজের মান-অভিমান নিয়েই ব্যস্ত। আমার মনের ভাব-আবেগ, ভালো-লাগা-মন্দ-লাগা, খেয়াল-খুশি, সংস্কার —আমাকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু দশে মিলে যেই কাজ করতে গেলাম অমনি দেখি আমার সংকীর্ণতা গুলো দেখে বাকি সবাই হোহো করে হেসে ওঠে, আবার আর কারুর সংকীর্ণতা দেখে যখন হাসির ধুম পড়ে তখন আমিও তার সঙ্গে গলা মেলাই। আর এইভাবে কাজ চলতে চলতে একদিন অবাক হয়ে দেখলাম, আমার ত্রুটি দেখে বাকি সবাই যখন হাসতে শুরু করেছে তখন সেই হাসির সঙ্গে আমার নিজের গলাও

মিশেছে। শুধু তাই নয়, আমার যে-ত্রুটি অন্যের চোখেও পড়ছে না তা আমার নিজের চোখেই ধরা পড়ছে—বাকি সবাইকে তা যেচে দেখিয়ে দিতেও লজ্জা লাগছে না। অন্যদের বেলাতেও সেই রকম।

কী শিখলাম? সমালোচনা করতে। কার সমালোচনা? পরের কাজের সমালোচনার সঙ্গে নিজের কাজেরও।

তাহলে, শেখাতে গিয়ে জরুরী কথা শেখা গেলো।

॥ দুই ॥ সমালোচনার মূল্য। পরের এবং নিজের, দুইই।

আর কিছু কি শিখি নি? শিখেছি।

দশজনে মিলে একসঙ্গে বসে দশ বিষয়ের আলোচনা করেছি। আলোচনা করতে করতে দেখি আমি যা জানতাম না তা জানতে পারছি, আমি যে-কথা ভাবতে পারতাম না তা ভাবতে পারছি। আগে হলে কী করতাম? যে-কথা স্পষ্টভাবে জানা নেই, যে-কথা স্পষ্টভাবে ভাবতে পারতাম না, সে-সব কথা নিজের মর্জি-রুচি দিয়ে বানিয়ে নিতাম। জ্ঞানের ফাঁকটা পূরণ করতাম মনগড়া কথা দিয়ে। সেটা যে কতোখানি ভুল তা বুঝলাম একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে। বুঝলাম, সত্যি কথাটা আমার মনমেজাজের পরোয়া করে না। যা সত্যি তা সত্যি। বাস্তব তথ্য। এর নাম বস্তুনিষ্ঠা।

তাহলে, শেখাতে গিয়ে আরো কথা শেখা গেলো।

॥ তিন ॥ বস্তুনিষ্ঠা।

আর কিছু কি শিখি নি? শিখেছি।

আমরা বহুত বইপত্র ঘাঁটলাম। মাথা ঘামালাম। লেখা

তৈরি হলো। ছবি তৈরি হলো। কিন্তু তারপর? তারপরের কাজটুকু শুধু মাথা ঘামিয়ে হয় না। তার জন্যে রীতিমতো গতর খাটাতে হয়, হাতের কাজ করতে হয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। ছবিগুলোকে তুলে আনতে হবে দস্তার পাতের ওপর। তাকে বলে ব্লক তৈরি করা। শিসের হরফ সাজিয়ে সাজিয়ে লেখাটাকে ছাপার যন্ত্রের দিকে এগিয়ে দিতে হবে, হুঁশিয়ার হাতে যন্ত্রকে চালাতে হবে—তবেই লেখা ছাপানো বইএর দিকে এগুবে। তারপরও কথা আছে। ছাপা কাগজ নিয়ে যেতে হবে দপ্তরীর বাড়ি। সেখানেও কারিগরদের হাত না হলে চলবে না। বই লিখে আমরা তো গর্বে মটমট করছিলাম। কিন্তু সে শুধুই মাথার কাজের দিকটুকু। হাতের কাজ বাদ দিলে যে-উদ্দেশ্যে লেখা তা আর জন্মে হতো না। আমরা তাই এই হাতের কাজকে শ্রদ্ধা করতে শিখলাম। সে-শিক্ষা আমাদের কাছে দুর্মূল্য। শিখলাম, শারীরিক শ্রমের মর্যাদা।

তাহলে, শেখাতে গিয়ে অনেক কথাই শেখা হলো।

॥ চার ॥ শারীরিক শ্রমের মর্যাদা।

মানুষের মাথা আর মানুষের হাত, মানুষের বুদ্ধি আর মানুষের শ্রম,—দুয়ে মিলে পৃথিবীকে কী অপরূপই না করে তুলেছে।

ছিলো বনের ঘাস জঙ্গলের বাঁশ, মানুষের হাতে পড়ে সভ্যতার এক আশ্চর্য উপাদান হয়ে উঠলো। কাগজ। মাটির তলায় শিসে পড়ে ছিলো বোবার মতো, মানুষের হাতে পড়ে হয়ে উঠলো মুখর হরফ। পাথরের মধ্যে লুকিয়ে ছিলো লোহা, মানুষের হাতে পড়ে হয়ে উঠলো অপরূপ যন্ত্র!

সেই যন্ত্রে চেপে শিসের হরফগুলো শাদা কাগজের ওপর রটিয়ে দিলো জানবার কথা।

পুরো ব্যাপারটা যে কতো খানি আশ্চর্য তা সব সময় মনে থাকে না। অথচ সত্যিই আশ্চর্য।

কী করে সম্ভব হলো এই আশ্চর্য ঘটনা? মানুষ মাথা খাটিয়েছে। শুধু তাই নয়। মানুষ গতরও খাটিয়েছে।

মাঠ থেকে, জঙ্গল থেকে ঘাস কেটে এনেছে, বাঁশ কেটে এনেছে। মাটি খুঁড়ে তুলে এনেছে শিসের তাল, লোহার খনিজ। হাজার হাজার মানুষ। তাদের হাড়ভাঙা খাটুনি না হলে কাগজ হতো না, শিসের হরফ হতো না।

অথচ কই, এদের কথা তো মনে থাকে না! কেন থাকে না? তার কারণ, আমরা শিখলাম, আমাদের ভাববার অভ্যাসে একটা ভুল আছে। কী ভুল? গতর খাটানোকে আমরা ছোটো করি, হেয় মনে করি। কী ভুল? শ্রমের মর্যাদা মনে না রাখা। শ্রমিকের মর্যাদা মনে না রাখা।

হাতের কাজকে আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখলাম।

আর এই শ্রদ্ধাই আমাদের মন থেকে দূর করলো মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে অমূলক আশঙ্কা। কেননা, পৃথিবীর এই যে এতো কোটি মানুষ, তাদেরই শ্রম দিয়ে চলছে পৃথিবী। তাই মুষ্টিমেয় লোক যদি পৃথিবীটাকে ধ্বংস করবার চক্রান্ত করে তাহলে ওই কয়েক কোটি মানুষ আজ রুখে দাঁড়াবে। তারা বলবে: শান্তি চাই, সৃষ্টি চাই, নতুন পৃথিবী চাই।

পৃথিবীতে শান্তি আসবে। সৃষ্টি চলবে। তার প্রতিশ্রুতি মানুষের হাতে, মানুষের জ্ঞানে।

ছবিটা আদালতের নয়। তবুও এটা এক বিচারের দৃশ্য।

কার বিচার? অপরাধটাই বা কী?

অপরাধ—ধর্মদ্রোহ, ধর্মবিরুদ্ধ কথা প্রচার। তাই বিচার। রাজার বিরুদ্ধে কথা বললে আজকাল জেল হয়; ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বললেও একটা যুগে প্রচণ্ড শাস্তি হতো। তাই এ-ছবিতে যারা বিচারে বসেছে তারা সাধারণ হাকিম-হুজুর নয়—গির্জার পাণ্ডা-পুরুত। তারাই বিচারক।

অবশ্য যাঁর বিচার হচ্ছে তিনি সোজাসুজি ভগবান সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নি। তিনি শুধু বলেছেন যে পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘোরে।

এই কথা মুখ ফুটে বললে ধর্মের কদর কী এমন কমে যে তার জন্যে আদালত বসাতে হবে! এ তো কোনো আজগুবি

কথা নয়, আন্দাজি কথাও নয়—খাঁটি সত্যি কথা। হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেওয়া যায়।

তাজ্জব ব্যাপার!

হ্যাঁ, তাজ্জবের কথাই বটে। কিন্তু তাজ্জবের কথাও পৃথিবীতে কখনো কখনো শোনা যায়।

এই মামলার আসামী ৬৮ বছর বয়সের বৃদ্ধ এক বৈজ্ঞানিক। গ্যালিলিও। স্থান—ইতালির রাজধানী রোম শহর। কাল—১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ। প্রধান বিচারক—খ্রীষ্টীয় ধর্মজগতের মোহান্ত, তার উপাধি পোপ।

তখনকার কালে পোপের ছিলো প্রবল প্রতাপ। এমনকি দেশের রাজাও তার কথা মানতে বাধ্য।

পোপ বলতো, ধর্মের বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি করতে পাবে না। করলে কঠিন শাস্তি হবে।

তাই মাঝে মাঝে বিচারে বসতো পাণ্ডা-পুরুতের দল। কেউ ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলেছে? তাহলে তাকে শাস্তি দিতে হবে। এ তাই সাধারণ আদালতের বিচার নয়। অন্য এক রকমের বিচার। এর নাম ইন্‌কুইসিশন্।

শাস্তির বিধান কিন্তু একটুও নরম নয়। পুড়িয়ে মারা, সদর রাস্তায় ফাঁসিতে লটকে দেওয়া, চাবকাতে চাবকাতে মেরে ফেলা। কেবল তলোয়ার দিয়ে গলা কাটা বাদ। ওদের শাস্ত্রে আছে, রক্তপাত করা পাপ।

খ্রীষ্টানদের ধর্মের পুঁথি অনুসারে নাকি সূর্যই পৃথিবীর চারিপাশে ঘোরে। শাস্ত্রের বচন কি মিথ্যে হতে পারে?

ধর্মগুরু পোপের আদালতে।বজ্ঞানসাধক গ্যালিলিওর অপরাধ এই যে তিনি নিজের চোখে-দেখা সত্যকেই মেনেছেন—ধর্মের পুঁথিকে অন্ধ বিশ্বাসকে ভ্রান্ত সংস্কারকে মানেন নি।

গ্যালিলিওর চেয়ে কিছুদিন আগেই কোপার্নিকাস্ বলে একজন বৈজ্ঞানিক নানা রকম হিসেবপত্র করে প্রমাণ করতে চান যে আসল কথা হলো পৃথিবীই ঘুরছে সূর্যের চারিদিকে। খ্রীষ্টান ধর্মগুরুরা বললেন, এ-কথা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না, তাই পাষণ্ডের মতো কথা। এ-কথা কেউ মুখে আনতে পারবে না। এদিকে এক যন্ত্র বানিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে গ্যালিলিও বুঝলেন কোপার্নিকাসের কথাই ঠিক। নির্ভীকভাবে সেই কথা তিনি বইতে লিখেও ফেললেন। খেপে উঠলো পাণ্ডা-পুরোহিতের দল, বন্দী করে আনা হলো বৃদ্ধ গ্যালিলিওকে।

শোনা যায়, গ্যালিলিওর ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালানো হয়েছিলো। তাঁকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে বলতে বাধ্য করা হয়েছিলো যে, আমি যা লিখেছি তা ভুল, আমি অন্যায় করেছি।

কিন্তু তবুও—গ্যালিলিও সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নাকি বলেছিলেন—সত্যি বলতে যে পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।

এই ঔদ্ধত্যের জন্যে বৃদ্ধ গ্যালিলিওকে বাকি জীবন বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিলো। তবু তিনি তাঁর মত বদলান নি।

সত্যের সাধক গ্যালিলিওকে প্রণাম।

বুক পেতে নির্যাতন বরণ করেছেন তবু অন্ধ বিশ্বাস আর ধর্মসংস্কারের কাছে তিনি সত্যকে খাটো হতে দেননি।

এতো বড়ো বিশ্বাসের জোর, এমন অমিত সাহস গ্যালিলিও কোথায় পেলেন যে তিনি বৃদ্ধ বয়সের সুখকে ত্যাগ করলেন তবু সত্যকে ত্যাগ করলেন না ?

সে জোর নিজের-চোখে-দেখার জোর।

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেই কি আকাশের সমস্ত রহস্য দেখা যায় ? তাহলে, গ্যালিলিও আকাশের রহস্য স্বচক্ষে দেখলেন কেমন করে ?

দুটিমাত্র চোখই তাঁর ছিলো। কিন্তু অনেক দিনের পরিশ্রমে বহু চিন্তার পর তিনি একটি তৃতীয় চোখ লাভ করেছিলেন। *সেই চোখটি একটি যন্ত্রমাত্র। তার নাম—*

টেলিস্কোপ

গ্যালিলিও তাঁর টেলিস্কোপের সামনে বসে রয়েছেন : আকাশের রহস্য আবিষ্কারে এই প্রথম টেলিস্কোপের প্রয়োগ

বাঙলায় আমরা যাকে বলি দূরবীন। যে-যন্ত্র হাতে নিয়ে আজকের মানুষ পৃথিবীর একটি কোণে বসে বিশাল নক্ষত্রজগৎ ও গ্রহজগতের রহস্য ভেদ করেছে, সেই মহামূল্য দূরবীন-যন্ত্রটি মানুষের হাতে তুলে দেন গ্যালিলিও। গ্যালিলিও নিজের হাতে টেলিস্কোপ বানান এবং তিনিই প্রথম এই যন্ত্রের সাহায্যে আকাশের রহস্য অনুসন্ধান করতে শুরু করেন।

গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ আর আধুনিক যুগের টেলিস্কোপে অবশ্য অনেক তফাত। সেকালের ঘোড়ায়-টানা ট্রাম আর আজকালকার ইলেকট্রিক ট্রামে যেমন আকাশ-পাতাল তফাত। তার চেয়েও বেশি। আধুনিক যুগের টেলিস্কোপের পাল্লা বেড়ে গেছে, তাতে ফটো তুলে নেওয়া যায়, দূর নক্ষত্র থেকে আসা
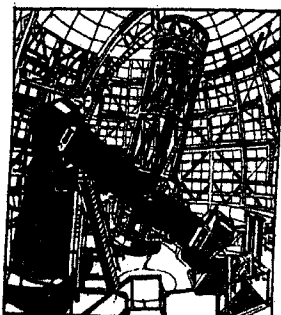
অতি-আধুনিক টেলিস্কোপ। গ্যালিলিওর সাদাসিধে টেলিস্কোপের সঙ্গে কত তফাত!

আলোকেও আলাদা-আলাদাভাবে ভেঙে ফেলা যায়। আধুনিক মানুষ তার জটিল টেলিস্কোপকে ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারবে বলে তার জন্যে বানিয়েছে বিশেষ ধরনের প্রাসাদ, যাকে আমরা বলি অবজারভেটরি।

টেলিস্কোপের ওপর রাস্তা চেনাবার ভার দিয়ে আমরা আকাশের মহারাজ্যে ঢুকে পড়লাম।

সূর্য ॥ বিরাট একটি নক্ষত্র। তার মধ্যে কঠিন কিছু নেই, সমস্ত কিছুই আছে জ্বলন্ত গ্যাসের রূপে। সেই নক্ষত্রটি সূর্য।

তেজের ভাণ্ডার সূর্য। সূর্যের তেজ আলোর ঢেউ হয়ে ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে মহাশূন্যে, এসে পৌঁছচ্ছে আমাদের চোখে। সেই আলো দিয়েই আমরা আমাদের পৃথিবীকে চিনি, সূর্যকেও চিনি।

বিরাট সূর্য। কিন্তু কতো বড়ো? হিসেব করে জানা গেছে ১৩ লক্ষ পৃথিবী সূর্যের কোলে অনায়াসে জায়গা পেতে পারে।

তবে তাকে আমরা একখানা বগিথালার চেয়ে বেশি বড়ো দেখি না কেন? এইজন্যে যে পৃথিবী থেকে সূর্য আছে অনেক —অনেক দূরে : প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে।

কিন্তু এতো বড়ো অঙ্কের হিসেবটা তো সত্যিই সহজে আমাদের মাথায় ঢুকবে না। একলক্ষ মাইল যে কতোটা পথ সে কথাটুকুই স্পষ্টভাবে বোঝা কঠিন। তাই এসো একটা কাল্পনিক উপমার সাহায্যে কথাটাকে একটু ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

বাতি জ্বালতে গিয়ে অসাবধানে আঙুলটা একটু পুড়ে গেলো। আমি টের পেলাম, আঙুলে ছ্যাঁকা লেগেছে। কী করে টের পেলাম? বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, আমাদের শরীরের মধ্যে স্নায়ু বলে একরকম সরু-সরু সুতোর মতো জিনিস রয়েছে। ইলেকট্রিক তার বেয়ে যে-রকম টেলিগ্রাফের খবর চলে তেমনি ভাবেই আঙুলের ডগা থেকে স্নায়ু বেয়ে মগজ পর্যন্ত ছ্যাঁকা লাগবার খবর এলো। তবেই আমি টের পেলাম।

স্নায়ু বেয়ে এই খবরটা কতো জোরে দৌড়োয়? হিসেব আছে : সেকেণ্ডে একশো ফুট। এবার মনে করা যাক, এমন একটা দৈত্য আছে, পৃথিবী থেকে হাত বাড়ালে যার হাত সূর্যে পৌছতে পারে। দুঃসাহসী দৈত্যের হাত যতোই শক্ত হোক, সূর্যের গা ছোঁবা মাত্রই যাবে পুড়ে। কিন্তু পুড়ে যাওয়ার এই যন্ত্রণাটা তার স্নায়ু বেয়ে মগজ পর্যন্ত পৌছোতে সময় লাগবে প্রায় একশো ষাট বছর। কিন্তু দৈত্য কি আর অতো বছর বাঁচবে? তাই তার হাত পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও সে-কথা দৈত্যটা টেরই পাবে না।

তাহলে বুঝে দেখো, সূর্য থেকে পৃথিবীটা কতো দূরে : এক সেকেণ্ডে ১০০ ফুট দৌড়েও একটা খবর সূর্য থেকে পৃথিবী পর্যন্ত আসতে ১৬০ বছর সময় নেবে!

ভাগ্যিস সূর্য এতো দূরে! গ্রীষ্মকালে কলকাতায় ১০০ ডিগ্রি তাপ উঠলে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। পশ্চিমের শহরে গরম লু বইতে থাকলে কতো লোকের জীবনই শেষ হয়ে যায়। ১০০ ডিগ্রিতেই যখন এই অবস্থা, তখন ১০,০০০ ডিগ্রি তাপের আঁচ লাগলে মানুষের শরীরের কী থাকতো একমুঠো ছাই ছাড়া? হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, সূর্যের তাপ অন্তত ১০,০০০ ডিগ্রি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলতে হয়, ভাগ্যিস সূর্য গরম। আমাদের এ প্রাণ সূর্যেরই দান। গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশু-পক্ষী, মানুষ—সূর্যের তাপেই এরা রক্ষা পাচ্ছে। আমাদের সবাইকার সবটুকু শক্তিই শেষ পর্যন্ত সূর্যের কাছ থেকেই পাওয়া।

অবশ্য, সূর্যের মোট তাপের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই মাত্র পৃথিবীর ওপর এসে পড়ে। বাকিটা ছড়িয়ে যায় আকাশের এদিকে-ওদিকে। আবার একটা কাল্পনিক হিসেব নেওয়া যাক : সূর্যের সারা বছরের তাপের দাম যদি হয় ১৮০০ কোটি টাকা, তাহলে সারা বছরে পৃথিবীর কপালে জোটে মাত্র ৯ টাকা।

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে বটে, কিন্তু সূর্য নিজেও স্থির নেই। লাট্টুর মতো পাক খেয়ে খেয়ে ক্রমাগতই সে ছুটছে। আর শুধু নিজেই ছুটছে না, সঙ্গে সঙ্গে আরো ৯টি গ্রহকে তার চারপাশে ঘোরাচ্ছে। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো—এই ৯টি গ্রহকে নিয়ে মহাশূন্যে সূর্যের পরিবার, যার নাম সৌরমণ্ডল।

আগেই বলেছি, সূর্য এক জ্বলন্ত ফুটন্ত গ্যাসের পিণ্ড। সেই গ্যাস সূর্যের বুকে সারাক্ষণ আগুনের ঝড় বইয়ে দিয়ে চলেছে। আর সেই ভীষণ ঝড়ের ঝাপটে সূর্যের গা থেকে লম্বা-লম্বা আগুনের শিখা লাফ দিয়ে-দিয়ে উঠছে—কখনো কখনো সূর্যকে ছাড়িয়ে তিন-চার লক্ষ মাইল পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে। কিন্তু যতো উঁচুতেই তারা যাক, আবার ফিরে আসতেই হচ্ছে। সূর্যের একটা মাধ্যাকর্ষণের টান আছে তো!

সূর্যকে ঘিরে ৯টি গ্রহ অবিরাম ঘুরছে। তাদের এই সূর্য-প্রদক্ষিণের পথগুলো ডিমের মতো গোল। আর-একটি কথাও বিশেষ করে মনে রাখা দরকার—সব গ্রহেরই ঘোরবার ঝোঁকটা পশ্চিম থেকে পুবে।

সূর্যের সবচেয়ে কাছে আছে বুধগ্রহ। মাত্র তিন কোটি

মাইল দূরে। সূর্যমুখী ফুলের মতো তার একটি দিক বরাবরই সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। অন্যপিঠে অন্ধকার চিররাত্রি।

খিটখিটে মাথা-গরম লোকেরা যেমন মানুষ দেখলেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে ওঠে, সূর্যের এতো কাছে আছে বলে বুধের মেজাজটাও তেমনি সব সময়ে তিরিক্ষি হয়েই আছে। কোনো জীবজন্তুই ভয়ে তার কাছ ঘেঁষে না। বাতাসই ঘেঁষে না—তো জীবজন্তু। বাতাসের স্বভাবই এই যে গরম বাড়লেই সে পালাই পালাই করে। দেখেছো তো, কোনো জায়গায় আগুন লাগলে আকাশের বাতাস কী রকম ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। বুধ সূর্যের অতো কাছে বলেই প্রচণ্ড তার আঁচ ; সে আঁচে কারুর পক্ষে বাঁচা তো দূরের কথা, আবহাওয়া পর্যন্ত উড়ে যায়।

তারপরের পথ শুক্রের দখলে। শুক্র আমাদের চেনা গ্রহ। বছরের এক সময়ে সূর্য ডুবে গেলে সে দেখা দেয় পশ্চিম আকাশে, তখন বলি সন্ধ্যাতারা। বছরের আরেক সময়ে সূর্য ওঠার আগে পুব আকাশে তাকে দেখি, তখন বলি শুকতারা। বলি বটে তারা, কিন্তু শুক্র তারা নয়—গ্রহ। শুক্রকে ঘিরে আছে ঘন মেঘের একটা পর্দা—সেই পর্দা ভেদ করে ভেতরের খবর বিশেষ কিছু জানা যায় নি।

শুক্রে কি প্রাণী আছে ? কেমন করে থাকবে ? অক্সিজেন না থাকলে কোনো প্রাণীই বাঁচে না। অথচ শুক্রে অক্সিজেন নেই বললেই চলে। আছে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস—প্রচুর পরিমাণে। তবে পণ্ডিতেরা বলেন, শুক্রে একদিন হয়তো প্রাণীর জন্ম হতে পারে। প্রথম অবস্থায় পৃথিবীতেও অক্সিজেন

গ্যাস ছিলো কম, কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস ছিলো বেশি। পরে গাছপালার দৌলতে পৃথিবীতে অক্সিজেনের জমা অনেক বেড়ে গেছে। গাছপালা কেমন করে অক্সিজেন তৈরি করে চলে সে-সব মজার ব্যাপার জানতে চাও তো একটু ধৈর্য ধরো।

এর পরে পৃথিবী। পৃথিবীর খবর সবশেষে শোনা যাবে।

পৃথিবী পেরিয়ে মঙ্গল। লাল রঙের এই গ্রহটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে। মঙ্গলগ্রহে কোনো জীবন্ত জিনিস আছে কি নেই, এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলছে। পৃথিবীতে যেমন খাল আছে, মঙ্গলেও আছে তেমনি খাল। কিন্তু পৃথিবীর খালের মতো সেগুলো আঁকাবাঁকা নয়—একটানা লম্বা-লম্বা। গ্রীষ্মকালে যখন বরফ গলে, সেই খালগুলো কানায় কানায় ভরে ওঠে। এইরকম সোজা সোজা খাল দেখে কেউ কেউ কল্পনা করেন, মঙ্গলগ্রহে নিশ্চয়ই মানুষ আছে, নইলে অমন সোজা-সোজা খাল কাটলো কে? কিন্তু আর-এক দল পণ্ডিত এ-কথায় আপত্তি করেন। বলেন, আসলে সেই খালগুলো সোজা নয়, চোখের ভুলে সোজা দেখায়।

মঙ্গলকে পিছনে রেখে বৃহস্পতির দিকে এগোবার রাস্তায় দূরবীনের চোখে দেখা যায় অসংখ্য টুকরো টুকরো জিনিস জ্বলজ্বল করছে। ওখানে নাকি অসংখ্য টুকরো গ্রহ ঝাঁক বেঁধে আছে। ছোটো গ্রহ, তাই নাম গ্রহিকা।

এই অতি-ছোটোদের ছাড়িয়ে এলে দেখা হবে অতি-বড়ো গ্রহ বৃহস্পতির সঙ্গে। গ্রহরাজ বৃহস্পতি। আমাদের দেশে পুরাণের গল্পে আছে বৃহস্পতি আবার দেবতাদের গুরু, বুড়ো

পণ্ডিতমশাই-গোছের মানুষ। তাই বোধহয় সমস্ত তাপ খুইয়ে গ্রহটি একেবারে কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বৃহস্পতিতে যদি কেউ কোনোদিন যায়, কাঁদতে কাঁদতে সে সারা হয়ে যাবে। কারণ বৃহস্পতির শরীর অ্যামোনিয়া গ্যাসে ঠাসা ; সেই গ্যাসে কাঁদায়।

তারপরে শনির সঙ্গে দেখা। শনির চেহারাটা কিছুতেই চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। শনির চারপাশে তিনটে মালার মতো জিনিস ঘুরপাক খাচ্ছে। এগুলো হলো এক-ঝাঁক অতি-ছোটো জিনিসের চাকা।

এ-পর্যন্ত যে ছটি গ্রহের সঙ্গে পরিচয় হলো তাদের খালি চোখে দেখা যায়। এর পরে যে-গ্রহ আছে—ইউরেনাস—দূরবীন ছাড়া তাকে দেখা যায় না।

ইউরেনাসের পিছু নিয়ে চলতে চলতে আরও একটি গ্রহের দেখা মিললো, সে নেপচুন। এছাড়া খুব হাল আমলে—মাত্র কুড়ি-বাইশ বছর আগে—আর-একটি গ্রহের খবর পাওয়া গেলো। তার নাম প্লুটো।

এই হলো সংক্ষেপে ৮টি গ্রহের পরিচয়। পৃথিবীর পরিচয় এখনও বাকি আছে।

সব গ্রহেরই জন্ম সূর্য থেকে, তারা সকলেই সূর্যের দেহের এক-একটি অংশ। কেউ বড়ো, কেউ ছোটো। সূর্যের দেহ যে-সব উপাদানে তৈরি এদের দেহেও কমবেশি সেই সব উপাদানের মিশেল—কোনো গ্রহে উপাদানগুলো এখনো তপ্ত গ্যাসের মতো, কোথাও বা ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে গেছে।

যেভাবে সূর্যের দেহ থেকে গ্রহের জন্ম, সেইভাবেই ঘূর্ণ্যমাণ গ্রহের থেকে উপগ্রহের সৃষ্টি। পৃথিবী গ্রহ, চাঁদ উপগ্রহ। সব গ্রহের উপগ্রহ নেই : মঙ্গলের আছে ২টি, বৃহস্পতির ১১টি, শনির ৯টি, ইউরেনাসের ৫টি, নেপচুনের ১টি, পৃথিবীর মাত্র ১টি, তার নাম চাঁদ।

পৃথিবীর মতো অন্য কোনো গ্রহে কি প্রাণ আছে ? আগেই বলেছি, মঙ্গলকে নিয়ে পণ্ডিতদের কথা-কাটাকাটি চলছে। কিন্তু অন্য গ্রহগুলো নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। তাঁরা বলেন, যতোটুকু উত্তাপ থাকলে আর বাতাসে যতোটুকু অক্সিজেন থাকলে কোনো জীবের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব, তা অন্য কোনো গ্রহে নেই। তবে শুক্রগ্রহে অনেক পরে কোনো কালে প্রাণের জন্ম সম্ভব হতেও পারে।

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা—
আর পরপারে একখানি মেঘেঢাকা গ্রাম।

কোনো মন্ত্রে আমি যদি আরো দু-তিন মাইল পর্যন্ত চারিদিকে চোখের পাল্লাকে বাড়িয়ে নিতে পারতাম, কী

দেখতাম? চারিদিকে থই-থই জল, মাঝে-মাঝে দ্বীপের মতো ভেসে আছে কোথাও গ্রাম, কোথাও খেত, কোথাও শুধু এক-ঝাঁক সুপুরিগাছ।

আমাদের বিষয় হলো নক্ষত্রজগৎ। কবিতার ছবি দিয়ে কথাটা পাড়লাম বুঝতে সুবিধা হবে বলে।

সূর্য একটি নক্ষত্র। কিন্তু একটিমাত্র নয়। অসীম শূন্যে আরো অসংখ্য নক্ষত্র ভিড় করে আছে। এক-এক দল নক্ষত্র আকাশের এক-এক জায়গায় বাসা বেঁধে আছে, একত্রে তাদের নাম নক্ষত্রমণ্ডল। আমাদের কলকাতা শহরের মতো বিরাট আকাশটাও যেন পাড়ায় পাড়ায় ভাগ-করা—এক-এক পাড়ায় এক-এক নক্ষত্রমণ্ডলের আড্ডা। কোথাও ভিড়টা গায়ে-গায়ে লাগা, কোথাও নক্ষত্রেরা আছে ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে। কোনো কোনো নক্ষত্র একা-একা থাকতে ভালোবাসে, যেমন আমাদের সূর্য। কোনো কোনো নক্ষত্র থাকতে চায় জোড়ায়-জোড়ায়, তাদের বলবো জুড়ি-নক্ষত্র।

এক-এক নক্ষত্রমণ্ডলের এক-এক রকম চেহারা। কেউ দেখতে মালার মতো, কারো চেহারা ভাল্লুকের মতো, কেউ ইংরিজি W অক্ষরের মতো। একটি নক্ষত্রমণ্ডল আছে, কাল্পনিক রেখা দিয়ে তাদের জুড়ে দিলে চেহারাটা একটা ধনুকধারী মানুষের মতো দাঁড়িয়ে যায়। বাংলায় আমরা তাকে বলি কালপুরুষ।

আলোরই বা কতো বাহার! কেউ জ্বলে দপদপিয়ে, কেউ মিটমিট করে। কারো আলো সাদা, কারো লালচে। কারো

আলো নিয়মমতো কমে-বাড়ে, কেউ হঠাৎ জ্বলে ওঠে দপদপিয়ে। কারো আলোর তেজ ক্রমশ নিভে আসছে। কেউ বা আলোর পুঁজি সর্বস্ব খুইয়ে চিরদিনের মতো নিভে গেছে।

আকাশে আরো যে কয়েকটি জিনিস চোখে পড়ে অল্প কথায় তাদের পরিচয় নেওয়া যাক।

নীহারিকা ॥ রাত্রির আকাশে নক্ষত্রদের সঙ্গে লেপে-দেওয়া আলোর মতো ছোটো বড়ো যে জিনিসগুলি চোখে পড়ে, তাদেরই নাম নীহারিকা। নীহারিকাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানবার আছে, আপাতত এইটুকু জেনে রাখলাম যে তারা হালকা গ্যাসের মেঘ।

ছায়াপথ ॥ অমাবস্যার রাতে আকাশে তাকালে দেখা যায় আকাশের এ-পার-ওপর-জোড়া ধবধবে সাদা যেন একখানা হার ছড়ানো রয়েছে। এটি ছায়াপথ। লক্ষ্য করলে দেখবে, আকাশের যতো তারা সব যেন ঐ ছায়াপথের কাছে এসে ভিড় জমিয়েছে। ছায়াপথটা দেখায় আধাগোল, কিন্তু আসলে ওটা পুরো গোল। পৃথিবীর ওপিঠে গেলে বাকি অর্ধেকটা দেখা যাবে।

ধূমকেতু ॥ মানে, ধোঁয়ার নিশান। এদের নিশানটা তৈরি খুব হালকা ধুলো দিয়ে। সূর্যের কাছে আসতেই সূর্যের আলোর দোলায় সেই নিশানটা পেখমের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

ধূমকেতুরা বড়ো দুর্বল জীব, শরীরটা অতো হালকা ধুলো দিয়ে তৈরি বলেই হয়তো। সূর্যই বলো, গ্রহই বলো, হাতের কাছে পেলে সবাই তার ওপর দিয়ে হাতের সুখ করে নেয়।

অর্থাৎ, তাদের প্রচণ্ড চাপে পড়ে তার শরীরটা ভেঙে ভেঙে যায়। তার জীবনটাই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মরেও নিস্তার নেই। পৃথিবীর কাছে এলেই তার মরা শরীরটা ধরে পৃথিবী এমন টান মারে যে, বাতাসের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি খেয়ে মরা শরীরটা জ্বলতে থাকে। তাকেই বলি উল্কা। অর্থাৎ, উল্কা হলো মরা ধূমকেতুর জ্বলন্ত শরীর।

তোমার হাতের পেন্সিলটা কতো লম্বা? চার ইঞ্চি। তুমি কতো উঁচু? চার ফুট। রেলপথে কলকাতা থেকে বোম্বাই কতো দূর? ১২২৩ মাইল।

পৃথিবীর সাধারণ দূরত্ব মাপবার সবচেয়ে লম্বা মাপকাঠি হলো মাইল।

কিন্তু আকাশের দূরত্ব যদি এই মাপকাঠি দিয়ে মাপতে যাই থই পাবো না। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ৯,৩০,০০০০০ মাইল। কিন্তু আমাদের সূর্য থেকে নীহারিকা অ্যাণ্ড্রো-মিডার দূরত্ব কতো মাইল? মাইলের মাপকাঠিতে আর কুলোবে না, অন্য মাপকাঠি বার করতে হবে। বৈজ্ঞানিকেরা সেই মাপকাঠি বার করেছেন। তার নাম আলোকবর্ষ। আলোকবর্ষ মানে কী?

মনে করো, এমন একটা মজার অলিম্পিকের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে শুধু মানুষ কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে যেখানে আছে সেই নাম দিতে পারবে সেই অলিম্পিকে দৌড়ে কে ফার্স্ট হবে বলতে পারো? আলো। দৌড়ে তার সঙ্গে কেউ

পারবে না। আলো সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল দৌড়তে পারে। তাহলে মিনিটে, ঘণ্টায়, দিনে, মাসে, বছরে কতো মাইল দৌড়বে? ১,৮৬০০০ মাইল × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫। গুণ করতে করতে মাথা ছিঁড়ে যাবে। পণ্ডিতেরা সেইজন্যে আকাশের দূরপাল্লা বোঝাবার একরকম সোজা মাপ বের করেছেন। তাকে বলেন আলোক-বর্ষ। আলোক-বর্ষ মানে হলো, এক বছরে আলো যতোদূর যায় ততোদূর। অর্থাৎ ৩৬৫ × ২৪ ৬০ × ৬০ × ১৮৬০০০ মাইল। অ্যাণ্ড্রোমিডা বলে নীহারিকা থেকে আলো আসতে লাগে প্রায় ন লক্ষ বছর। তাই বলা হবে, অ্যাণ্ড্রোমিডা ন-লক্ষ আলোক-বর্ষ দূরে রয়েছে। কতো সহজে বলা হলো। নইলে বলতে হতো এ্যাণ্ড্রোমিডা রয়েছে ৯০০০০০ × ৩৬৫ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ১৮ × ৬০০০ মাইল দূরে।

এইখানে একটা মজার কথা বলে রাখি। আলো আমাদের চোখের কাছে খবর বয়ে আনে বলেই তো আমরা নানান কথা জানতে পারি। সকালে দেখলাম, সূর্য উঠেছে। অর্থাৎ সূর্য থেকে আলো আমার কাছে এসে সূর্যের খবর দিলো। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে প্রায় আট মিনিট কুড়ি সেকেণ্ড। তার মানে, সূর্যের দিকে চেয়ে আমি এখন যে-খবরটা পাচ্ছি তা বেশ একটু বাসি-খবর—আট মিনিট কুড়ি সেকেণ্ড আগে খবরটা আলো মারফত সূর্য থেকে রওনা হয়েছে।

এবার আর-একটু দূর পাল্লার কথা ভেবে দেখো। ধরো অ্যাণ্ড্রোমিডার কথা। সেখানে বসে কেউ যদি আজ দূরবীন

নকল আকাশ : বৈজ্ঞানিকেরা বড়ো হলঘরের মধ্যে এই রকম নকল আকাশ তৈরি করে গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি বুঝতে চেষ্টা করেন। এর নাম প্ল্যানেটেরিয়াম। সিনেমার পর্দায় যেমন ছবি ফুটে ওঠে, এখানেও তেমনি একটা বিরাট গোলাকার গম্বুজের ভেতরদিককার দেয়ালের গায়ে আকাশের নানা গ্রহনক্ষত্রের ছবি ফুটে ওঠে।

নীহারিকা : বিশ্বকর্মার কারখানা। জ্বলন্ত গ্যাস আকাশে ভাসছে। একদিন হয়তো এই গ্যাসের থেকে আরো কতো লক্ষ-কোটি নক্ষত্র-লোকের সৃষ্টি হবে। নিচে : চাঁদের পাহাড়। টেলিস্কোপে চোখ দিয়ে দেখতে হবে।

অবাধ্য বালক : সূর্যশিখা : সূর্যের গা থেকে লাফ মেরে মেরে ২ লক্ষ মাইল পর্যন্ত ওপরে চলে যায়।

ছায়াপথ : অমাবস্যার রাতে আকাশে তাকালে দেখা যাবে, এপার-ওপার জুড়ে যেন সাদা আলোর একছড়া হার ছড়ানো রয়েছে। অসংখ্য তারা ওখানে ঝাঁক বেঁধে আছে।

নিচের ছবিতে একটি ধূমকেতু : লেজটা ২০ কোটি মাইল লম্বা। ১৮৪৩ সালে পথ ভুল করে সূর্যের পাড়ায় ঢুকে পড়েছিলো।
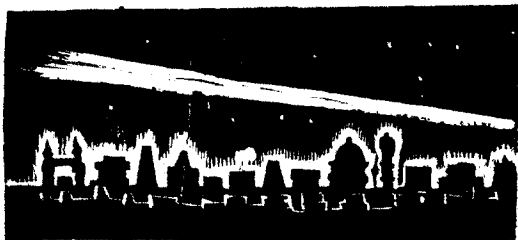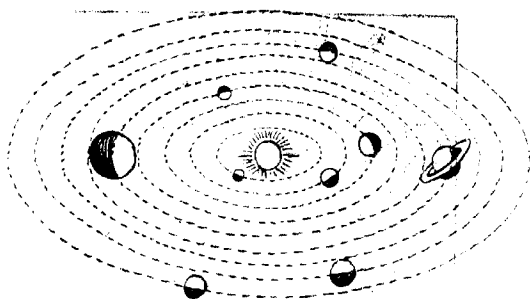
সৌরজগৎ : মাঝখানে সূর্য। সূর্যের সবচেয়ে কাছে বুধ, তারপরে শুক্র, শুক্রের পর পৃথিবী, পৃথিবীর পরে মঙ্গল, তারপরে গ্রহরাজ বৃহস্পতি, তারপর শনি, শনির পরে ইউরেনাস, তারপরে নেপচুন, সবশেষে প্লুটো।

এতো হাঁকাচ্ছেন কে?—যেই হোন, ক সের দুধ খেয়ে মাঠে নেমেছেন যে কবজিতে এতো জোর? দুধ গোরুর। গোরুর দুধ ঘাসপাতা খেয়ে। ঘাসপাতা তৈরি হচ্ছে সূর্যের তেজে। অতএব, শেষ পর্যন্ত সব শক্তির জোগান সূর্য থেকেই।

শীতের দিনের পরিষ্কার তারাভরা আকাশে দক্ষিণ দিকে মুখ করে ওপর দিকে তাকাও। দেখো, তারাগুলোকে কাল্পনিক লাইন দিয়ে জুড়ে জুড়ে এই রকম নানান মূর্তি তৈরি করা যায় কি না।

৫০ বছর আগে মেল ট্রেন কতো জোরে দৌড়তো ? মিনিটে এক মাইল। একটা আধুনিক রেসের মোটর ? মিনিটে ৩ মাইল। এরোপ্লেন ? ঘন্টায় ৬০০ মাইল। কামানের গোলা কতো জোরে ছোটে ? তিন সেকেণ্ডে ১ মাইল। আর আলো ? সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল।
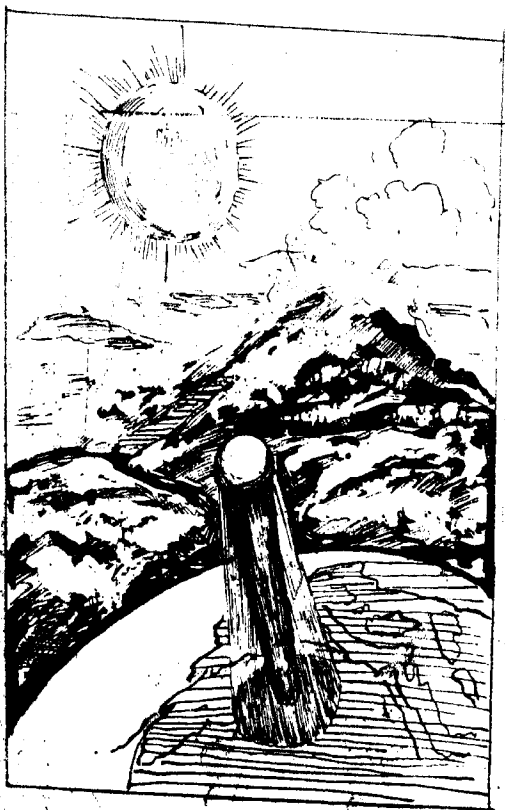
শূন্য থেকে যদি সূর্যগ্রহণ দেখো : চাঁদ সূর্যের সঙ্গে এক লাইনে এসে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর ওপরে গোলমতো যে-জায়গাটা সেখানে অন্ধকার, তবু সেখান থেকে সূর্যের একটু-আধটু দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যে-জায়গাটা বৃত্তের কেন্দ্র—সেখানে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

লাগিয়ে পৃথিবীকে দেখে তাহলে কী দেখবে? ন-লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে যা ঘটেছে তাই দেখবে। কেননা, আজ পৃথিবী থেকে যে আলো অ্যাণ্ড্রোমিডায় পৌঁছলো তা রওনা হয়েছে ন লক্ষ বছর আগে। তাই তার কাছে অতো বছর আগেকার বাসি খবর ছাড়া আর কী পৌঁছবে বলো?

এইবার আমাদের আকাশ থেকে নামবার সময় হয়েছে। এতোক্ষণ ধরে যাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো, তারা দূরের প্রতিবেশী। তাদের রকমারি সাজপোশাক, চালচলন আমাদের কৌতূহলের বিষয়। কিন্তু আকাশের লোক হয়েও যে আমাদের একেবারে ঘরের লোক হয়ে গেছে, যার সঙ্গে মানুষ মামা-সম্পর্ক পাতিয়েছে, সে চাঁদ। চাঁদকে নিয়ে মানুষ কতো ছড়া বেঁধেছে, কবিতা লিখেছে। সুন্দর মুখ বলতেই চাঁদমুখ।

কাছের থেকে, মানে দূরবীনে চোখ লাগিয়ে, দেখলে কিন্তু দেখা যাবে, চাঁদ এমন একটা আহা-মরি সুন্দর নয়। চাঁদের সারা শরীর জুড়ে কেবল বরফ-ঢাকা এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়, মাইলের পর মাইল বিরাট বিরাট খানা-খন্দ-গহ্বর। ঐ গহ্বরগুলো হলো নিভে-যাওয়া আগ্নেয়গিরির মুখ, ছাই দিয়ে সেই সব গহ্বর ভরতি।

চাঁদের দশা একদিক থেকে বুধের মতো। সেখানে জল নেই, বাতাস নেই। তাই কোনো জীবনও সেখানে নেই। ঠাণ্ডা, অন্ধকার ঘুমের দেশ চাঁদ।

জলবাতাস নেই, প্রাণও নেই। কিন্তু যদি জলবাতাস

থাকতো তাহলে কি প্রাণ থাকতে পারতো? মাঘের হাড়-কাঁপানো শীতে লেপমুড়ি দিয়ে 'কখন সকাল হবে, কখন সকাল হবে' ভাবতে ভাবতে দেখি, সূর্য উঠে গেছে। আবার, কাঠফাটা রোদ্দুরে জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎ সন্ধ্যা হতেই দেখি, ঝিরঝিরে বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। তার মানে, আমাদের পৃথিবীতে দিনরাত্রির ব্যবধান মোটের ওপর দশ-বারো ঘণ্টা। কিন্তু চাঁদে দিন মানে একটানা ১৫ দিন ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর—এমন রোদ্দুর যে যেখানকার যতো জল টগবগ করে ফুটছে। আর রাত মানে একটানা ১৫ দিন রক্তজমানো ঠাণ্ডা—এতো ঠাণ্ডা যে সব জল জমে বরফ। আমাদের দিনরাত্রি ২৪ ঘণ্টায়, চাঁদের দিনরাত্রি ৩০ দিনে।

এমন দেশে কেউ বাঁচে?

কিন্তু তবু চাঁদ সুন্দর। চাঁদের ভেতরে যাই থাক, চাঁদের অপরূপ আলোয় কার না চোখ জুড়োয়! কিন্তু এমনই পোড়া কপাল চাঁদের যে আলোটাও তার নিজের নয়। বলতে পারো ধার করা আলো। কেননা সূর্যের আলো চাঁদে পড়ে যখন ঠিকরে ফিরে আসে তখনই আমরা তাকে বলি চাঁদের আলো।

চাঁদের একটা দিক সব সময় পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। অমাবস্যা-পূর্ণিমার আলো-অন্ধকার সেইজন্যেই। চাঁদের যে দিকে সূর্যের আলো পড়ছে, শুধু পূর্ণিমার দিন সেই দিকটা পৃথিবীর দিকে পুরোপুরি ফেরানো থাকে বলে সেদিন আমরা চাঁদকে পুরোপুরি গোল দেখি। অমাবস্যার রাতে চাঁদের আলো-পাওয়া দিকটা থাকে মুখ ঘুরিয়ে, তাই সে

রাতে আমরা চাঁদের মুখ দেখি না। পৃথিবী সে রাতে অন্ধকার।

কলাম্বাসের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো। তিনিই প্রথম আমেরিকা মহাদেশের সন্ধান পান।

আমেরিকায় গিয়ে তাঁকে কতো ঝঞ্ঝাটই না পোয়াতে হয়েছিলো! একবার হলো কি, কলাম্বাসের জাহাজে সব খাবার ফুরিয়ে গেছে। লোকজন খায় কী? সেদেশের লোক না এনে দিলে খাবার পাওয়াই বা যাবে কোথায়? কিন্তু তারা খাবার দেবে না। সাদা চামড়ার লোকেদের ওপর তারা একটুও খুশি নয়। তখন কলাম্বাস তাদের ভয় দেখালেন, খাবার এনে না দাও তো সূর্যকে নিভিয়ে দেবো। আর সত্যি বলতে কি, কিছুক্ষণ পরে সূর্য নিভেই গেলো। তখন সেই আমেরিকার লোকেরা ভয়ে অস্থির হয়ে ভারে ভারে খাবার নিয়ে উপস্থিত। কলাম্বাস বললেন, আচ্ছা তোমাদের যখন সুবুদ্ধি হয়েছে তখন সূর্যকে আবার জ্বালিয়ে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ বাদে আবার সূর্য উঠলো।

ব্যাপারটা কী হলো বলতে পারো? সূর্যগ্রহণ।

কলাম্বাস জানতেন সে দিন সূর্যগ্রহণ হবে। পণ্ডিতেরা অঙ্ক কষে গ্রহণের দিনক্ষণ একেবারে কাঁটায় কাঁটায় বলে দিতে পারেন।

কিন্তু গ্রহণ ব্যাপারটা কী? সোজা ভাষায় বলতে পারো চাঁদ, সূর্য আর পৃথিবীর লুকোচুরি খেলা। কিন্তু বিজ্ঞানের তথ্য হিসাবে কথাটা দাঁড়াবে:

অমাবস্যার দিন চাঁদ সূর্য আর পৃথিবীর মধ্যিখানে থাকে।

কিন্তু প্রত্যেক অমাবস্যাতেই একেবারে ঠিক মধ্যিখানে থাকে না, একটু ওপরে বা একটু নিচে থাকে। যে অমাবস্যায় চাঁদ একেবারে ঠিক মধ্যিখানে থাকে, সে দিন সূর্যটা আড়ালে পড়ে যায়। কখনো পুরো সূর্যটা, কখনো সূর্যের একটা অংশ। তখন হয় সূর্যগ্রহণ। পুরো সূর্য ঢাকা পড়লে বলি পূর্ণগ্রহণ। চন্দ্রগ্রহণ হয় পূর্ণিমার রাত্রে—যে পূর্ণিমার রাত্রে পৃথিবী দাঁড়ায় চাঁদ আর সূর্যের ঠিক মধ্যিখানে। সে-রাত্রে পৃথিবীর ছায়া পড়ে চাঁদের গায়ে, তাই চাঁদের মুখ থাকে অন্ধকারে ঢাকা।
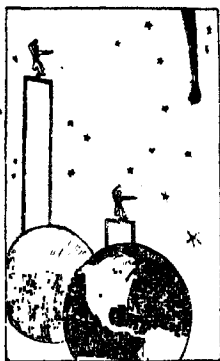
তুমি যদি পৃথিবীতে ছ'ফুট উঁচু হাই জাম্প মারতে পারো তাহলে চাঁদে গিয়ে পারবে ৩৬ ফুট হাই জাম্প মারতে! কেননা, চাঁদের চেয়ে পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি ছ'গুণ বেশি—অর্থাৎ, চাঁদের চেয়ে পৃথিবী তোমাকে ছ'গুণ জোরে মাটির দিকে টানছে।
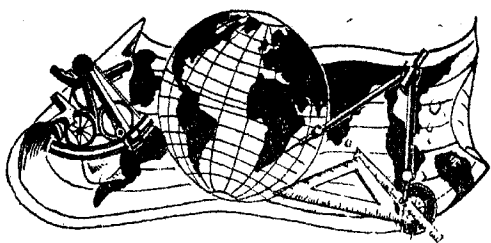
কতো কী নিয়ে সিনেমার ছবি হয়। কিন্তু পৃথিবীর কথা নিয়ে ছবি কেউ তোলে না! কতো কোটি বৎসরের পুরোনো এই পৃথিবী। কতো রঙ, কতো আলো, কতো বিচিত্র জীবন তার বুকে। ধরা যাক, আমরা একটা ফিল্ম তৈরি করলাম এই পৃথিবীর গল্প নিয়েই।

একে একে আলো নিভে এলো। পরদার পটে ফুটে উঠলো মহাশূন্যের ছবি। দেখি, আমাদের সূর্য আর সূর্যের মতো অসংখ্য জ্যোতিষ্ক বিরাট আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। কী তাদের গায়ের রঙ, কী তাদের জৌলুস। এক-একটা নক্ষত্র যেন এক-একটা গনগনে আগুনের গোলা।

পরের দৃশ্যে দেখি, হঠাৎ একটি নক্ষত্র সর্বনেশে বেগে আমাদের সূর্যের দিকে ছুটে আসছে। কী প্রচণ্ড টান সেই নক্ষত্রের—দেখতে দেখতে সূর্যের জ্বলন্ত গ্যাসের শরীর ফুলে ফেঁপে উথলে উঠলো, কোটালের বানে যেমন নদীর জল ফুলে ফেঁপে উথলে ওঠে। আর সেই হেঁচকা টান

সহ্য করতে না পেরে সূর্যের শরীর থেকে একটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে এলো। তার চেহারাটা নজর করে দেখ-লাম: পটোলের মতো পেটমোটা, দুই মুখ ছুঁচলো। সেই সর্বনেশে-টান-মারা নক্ষত্রটাকে কিন্তু আর কাছাকাছি দেখা গেলো না, এ-তল্লাট ছেড়ে দস্যিটা কোথায় গেছে কেউ জানে না। আর, সূর্যের-থেকে-ঠিকরে-আসা সেই টুকরোটা সূর্যের চারিপাশে বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে ৯টি ভাগে ভেঙে গেলো। বলে দিতে হবে কি যে এই ৯টি টুকরোই সূর্যের ৯টি গ্রহ?

নবগ্রহের ছবি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়, পর্দার বুকে দারুণ তেজে ফুটে ওঠে শুধু আমাদের এই পৃথিবীর ছবি—*পৃথিবীর শিশুকালের কাহিনী।*

কী দুরন্তপনা করেই না পৃথিবীর ছেলেবেলা কেটেছে! সূর্যের দেহ ছিঁড়ে সদ্য সে বেরিয়ে এসেছে—তাই তখনও পর্যন্ত সে সূর্যের মতোই একটা জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড: তার মধ্যে যা-কিছু আছে সবই আছে উত্তপ্ত গ্যাসের আকারে—তরল বলেও কিছু নেই, জমাট তো দূরের কথা।

সব গরম জিনিসেরই স্বভাব হলো তাপ ছড়ানো: আস্তে আস্তে তাপ ছড়াতে ছড়াতে ক্রমশ সে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

পৃথিবীর ওপর-পিঠের তপ্ত গ্যাস ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগলো। তখন তার কী ছটফটানি, কী অস্থিরতা! কোনো একটা শক্ত অঙ্ক যখন মিলি-মিলি করেও মিলতে

চায় না, পাতার পর পাতা তুমি কাটাকুটি করতে থাকো, তখন তোমার মনে যেমন ছটফটানি, পৃথিবীরও তখন তেমনি একটি ছটফটানি—গ্যাসের দেহ ছেড়ে অন্য একটা দেহ সে পাই-পাই করেও যেন পাচ্ছে না। তাই কেবলি ভাঙচুর, কেবলি তোলপাড়, কেবলি ওলোট-পালোট : কখনো তার বুকে দেখা দেয় অতল অসীম গহ্বর, কখনো সেই গহ্বর ফুঁড়ে মাথা তোলে বিরাট বিরাট পাহাড়, আর সেই পাহাড়ের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসে লকলকে আগুনের শিখা। সেই পাহাড় আবার দেবে বসে যায় গহ্বরে, কোথাও দেখা দেয় মহাদেশ। এমনি করে পৃথিবীর একেবারে সব-ওপরের পিঠটা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। আর গরম দুধে সর পড়লে সেটা যেমন ঠাণ্ডা হতে হতে কুঁচকে যায়, তেমনি পৃথিবীর সব-ওপর পিঠটা কুঁচকে যেতে লাগলো। কিন্তু কোঁচকানো ওপর-পিঠটা ঠাণ্ডা হয়ে এলেও ভেতরটা তখনও থেকে গেলো সাংঘাতিক গরম। সেখানকার গ্যাসগুলো আগের তুলনায় কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে, কিন্তু এমন ঠাণ্ডা হয়নি যে জমে শক্ত হয়ে যেতে পারে। তখনও সেগুলো টগবগ করে ফুটছে, আর মাঝে মাঝে পৃথিবীর ওপর-পিঠটাকে চৌচির করে ফাটিয়ে দিয়ে গলগলিয়ে বেরিয়ে আসছে তপ্ত তরল অগ্নিস্রোত।

আর পৃথিবীকে ঘিরে সে কী ঘন মেঘ! পৃথিবী অন্ধকার। অমন ঘন মেঘ ভেদ করে আসতে পারে সূর্যের আলো?

আর তারপর বৃষ্টি। বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি। প্রথম প্রথম বৃষ্টির জল পড়তেই পায় না—পড়ে আর বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। তখনও এতো গরম পৃথিবীর গা! আরেকটু ঠাণ্ডা হলে সেই জল পড়তে পেলো পৃথিবীর বুকে, আস্তে আস্তে ভরে উঠলো হ্রদ, খালবিল, সমুদ্র, মহাসমুদ্র। উত্তপ্ত সমুদ্র। কোনো শৌখিন ভদ্রলোক তখন যদি সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি, বসিয়ে হাজার দাঁড়ি' সমুদ্রভ্রমণের শখ মেটাতে যেতেন, কিছুদূর যেতে না যেতেই তাঁর জাহাজ পুড়ে খাক হয়ে যেতো।

এমনি সব ভাঙাগড়া চলতে লাগলো কতো দিন—

দিন কী?—বছর, কোটি কোটি বছর ধরে। এমনি করে দেড় শো কোটি বছর কেটে গেলো।

এতোক্ষণে জলে-স্থলে-মেশা পৃথিবীর যে-ছবি পর্দার বুকে ভেসে উঠলো তার সঙ্গে আমাদের এই আজকের পৃথিবীর অনেকখানি মিল দেখতে পাই। এতোটা সময়ের মধ্যে অনেকগুলো গ্যাস তরল হয়ে পৃথিবীর গহ্বরগুলো ভরে তুলেছে—দেখা দিয়েছে অতল অপার সমুদ্র। গ্যাসে ছিলো কী? লোহা ছিলো, নিকেল ছিলো। ছিলো আরো নানান জিনিস। এই সব জিনিসগুলো একে অন্যের সঙ্গে মিশে বানিয়ে তুললো আরো নতুন নতুন জিনিস।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, গ্যাসের চেহারা বদলে গেছে। কোনো কোনো গ্যাস গলে জলে মিশেছে, কোনো কোনো গ্যাস জমে শক্ত হয়ে জলের ওপর ভেসে রইলো। কিন্তু কোনো কোনো

গ্যাস গলতেও চায় না, জমতেও চায় না। সেগুলো গ্যাস হয়েই পৃথিবীর চারপাশ ঘিরে রাখলো। সেই ধরনের গ্যাস আজো থেকে গিয়েছে আমাদের বাতাসে।

দু ঘণ্টার ছবিতে দশ মিনিটের ইন্টারভ্যাল দেয়; নইলে চোখ টনটন করে, অনেকের মাথা ধরে যায়। আমাদেরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিতে হয়। অনেক নতুন কথা শিখলাম, সেগুলোকে একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

ইস্কুলের বইতে শিখে এসেছি পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল।

একটা মজার আবিষ্কারের কথা বলি। আরো মজার কথা, আবিষ্কারটা আমি বিছানায় শুয়ে শুয়েই করেছিলাম। একটা গ্লোব নিয়ে খানিকক্ষণ আস্তে আস্তে ঘোরাও, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এই কথাটাকে ঘোরাও যে পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। খানিকক্ষণ দেখতে দেখতে নিশ্চয়ই তোমার চোখে পড়বে যে, পৃথিবীর যতো স্থল সব ওপরের দিকের অর্ধেকটায় জড়ো হয়ে আছে, আর যতো সমুদ্র সবই যেন নিচের দিকে। অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে স্থল বেশি, দক্ষিণ গোলার্ধে জল।

আরো খুঁটিয়ে দেখলে আর-একটা ব্যাপার তোমার নজরে পড়বেই পড়বে। দেখো, মহাদেশগুলোর নিচের দিকটা ক্রমশ সরু হয়ে এসে সমুদ্রের ভেতর ঢুকে গেছে।

আরো একটা মজার ব্যাপার দেখতে চাও? নিজের হাতেই পরীক্ষা করে দেখো। পৃথিবীর যে-কোনো স্থল-অংশের ঠিক

উল্টো দিকে নিশ্চয়ই একটা জল-অংশ থাকবে। উত্তর আমেরিকার উল্টো পিঠে কী আছে দেখো। ভারত মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগরের ওপিঠে কী আছে দেখে বলো। ইউরোপ-এশিয়া। তার মানে কী হলো বলো তো! —পৃথিবীর যে দিকটা গর্ত, তার উলটো দিকটা ভরাট।

এসো পৃথিবীকে আরো খুঁটিয়ে দেখি।

পৃথিবী স্থলে আর জলে তৈরি।

বেশ, স্থল কী?

স্থল মানে ডাঙা বা মাটি।

এ জবাব দিলে পুরো নম্বর পাবে না। স্থল বলতে কি শুধুই মাটি বোঝায়?

আরেকটু ভেবে তুমি জবাব দিলে, মাটি আর পাথর।

এই জবাব দিয়ে আমার কাছ থেকে তুমি পুরো নম্বর আদায় করতে পারো, কিন্তু বৈজ্ঞানিককে খুশি করতে পারবে না।

তিনি বলবেন, পৃথিবীর স্থলভাগ তিন রকমের শিলা দিয়ে তৈরি। কেন? চলতি কথায় যাকে বলি পাথর, সাধু ভাষায় তাকেই তো বলে শিলা! তফাতটা কী হলো?

তফাত আছে। পণ্ডিতেরা কথা নিয়ে ছেলেখেলা করেন না। তাঁদের কাছে প্রত্যেক কথার একটা বাঁধাধরা মানে আছে। তাই তাঁরা প্রত্যেক কথা হিসেব করে ব্যবহার করেন—নইলে কাজ এগোয় না। পাথর বললেই আমাদের কোনো শক্ত আর ভারি জিনিসের কথা মনে পড়ে।

কিন্তু, বৈজ্ঞানিক বলবেন, শিলা সব সময়ে শক্ত আর ভারি

নাও তো হতে পারে। নরম আর হালকা শিলাও তো আছে।

যে কথা বলছিলাম। পৃথিবীর স্থলভাগ তিন রকমের শিলা দিয়ে তৈরি। পাললিক শিলা, আগ্নেয় শিলা আর পরিবর্তিত শিলা।

কিন্তু শিলা জিনিসটা আসলে কী? শিলায় আছে কী?

সৃষ্টিছাড়া নতুন জিনিস কী আর থাকবে? যে ৯২টি পদার্থ দিয়ে পৃথিবীর শরীর তৈরি, সেই সব পদার্থ কোথাও মৌলিক আকারে কোথাও যৌগিক আকারে থেকে তৈরি করেছে স্থল-পৃথিবীর শিলাস্তর।

তিন রকমের শিলা তৈরি হলো কী করে শোনো।

পাললিক শিলার জন্ম জলে।

নদীর স্রোতে পলিমাটি, পাহাড়ভাঙা পাথরের কুচি, নুড়ি, বালি ক্রমাগত সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। যেগুলো ভারি জিনিস সেগুলো আগে, সেগুলো হালকা সেগুলো আরো একটু দূরে গিয়ে সমুদ্রের বুকে সমান একটা স্তরে থিতিয়ে বসছে। এর পরে আরো একটা পলিস্তর, তার ওপরে একটা —এইভাবে থাকে থাকে পাললিক স্তর তৈরি হয়। ওপরের নতুন নতুন স্তরের চাপে আর জলের নানারকম অ্যাসিডের প্রভাবে নিচের স্তরগুলো জমাট বেঁধে শিলায় পরিণত হয়।

এইভাবে স্তরে স্তরে সাজানো থাকে বলে পাললিক শিলার আরেক নাম স্তরীভূত শিলা।

পৃথিবীর পুরনো দিনের ইতিহাস এই পাললিক শিলার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। পাললিক শিলা যেন মহাকালের

ঘড়ি। যখন মানুষ জন্মায় নি তখন পৃথিবীর কোন্ জায়গার জলবাতাস কেমন ছিলো, কোন্ জায়গায় কোন্ ধরনের জীবজন্তু বাস করতো, এ-সব খবর জানা যায় পাললিক শিলার ভেতর থেকে।

আগ্নেয় শিলার মধ্যে পাওয়া যায় পৃথিবীর একেবারে ছেলেবেলার কথা—যখন পৃথিবীর পেটের ভেতর থেকে গরম, তরল গ্যাস ফাটলের ফুটো দিয়ে অনর্গল বেরিয়ে আসতো। বেরিয়ে এসে ঠাণ্ডা হয়ে সেগুলো জমাট বেঁধে আগ্নেয় শিলার রূপ নিয়েছে।

ভারতবর্ষের তলাকার অংশ গোটা দাক্ষিণাত্য [illegible]ই তৈরি পৃথিবীর গহ্বর থেকে ওগরানো আগ্নেয় শিলা দিয়ে।

পাললিক শিলা আর আগ্নেয় শিলা এই দুটি হলো মৌলিক শিলা। জল, তাপ, চাপ, অ্যাসিড ইত্যাদির শক্তিতে এই দুই শিলার চেহারা পালটে গেলে তাকে আমরা বলি পরিবর্তিত শিলা।

শীতের দিনে খেজুরে গুড়! পৌষপার্বণে রকমারি পিঠের ভোজ! সেই খেজুরে গুড়ের নাগরির (কলসির) ভালো-মন্দ কী করে যাচাই করে? নাগরির মধ্যে একটা কাঠি নামিয়ে দিয়ে সেটাকে বার করে এনে দেখে গুড়টা কেমন পাকের, স্বাদ কেমন, গন্ধ কেমন, দানা ছোটো না বড়ো।

ঐ রকম কাঠি আমাদের চাই, পৃথিবীর ভেতরে কী আছে দেখবার জন্যে। তবে কাঠিটা খুব শক্ত আর খুব ধারালো

হওয়া চাই, আর তার গায়ে মাইলের হিসেবে দাগ কাটা থাকা চাই।

ঐ কাঠিটা যদি একেবারে পৃথিবীর পেটের ভেতর পর্যন্ত চালিয়ে দিয়ে তুলে নিয়ে আসি, দেখবো কাঠিতে লেগে আছে গলা তপ্ত লোহা আর নিকেল। এই দুটো ধাতুই সবচেয়ে ভারি। তাই ওরা একেবারে নিচে গিয়ে জমে আছে। অর্থাৎ, পৃথিবীকে যদি একটা আঁটিওয়ালা ফলের সঙ্গে তুলনা করো, তবে পৃথিবীর আঁটিটা হবে লোহা আর নিকেল দিয়ে তৈরি। এ-আঁটি কিন্তু তরল।

আঁটিটা গোল, বলের মতো। তার ব্যাস চার হাজার মাইল।

এই আঁটির ঠিক ওপরে যে-স্তর তার নাম ব্যারি[illegible]য়ার। এই স্তরের গভীরতা ২০০০ মাইল। এই স্তরে আছে লোহা, নিকেল আর আরো কয়েক রকমের শিলা। এই স্তরের উষ্ণতা সাংঘাতিক, কিন্তু ওপরকার স্তরের ভীষণ চাপে উষ্ণতা সত্ত্বেও এই স্তরের শিলাগুলো জমাট বেঁধে আছে।

এর পরে যে-স্তর সেটার গভীরতা তেমন বেশি নয়। এটা একটা মি[illegible]শাল স্তর।

এর পরের স্তরটির নাম লিথোস্ফিয়ার। লিথো মানে শিলা, বাঙলায় বলতে পারি শিলাময় স্তর। এ স্তরের গভীরতা ২৫ থেকে ৩০ মাইল। পণ্ডিতেরা বলেন, লোহা, নিকেল প্রভৃতি ভারি জিনিসগুলো যখন নিচে থিতিয়ে বসতে লাগলো, তখন তার থেকে হালকা জিনিসগুলো দানা

বেঁধে-বেঁধে ওপরে ভেসে উঠতে লাগলো। সেই হালকা শিলা দিয়েই এই শিলাময় স্তর তৈরি। এই স্তরের আবার ২টি উপস্তর : নিচের উপস্তরে লোহার খনি, ওপরের উপস্তরে *গ্রানাইট শিলা।*

এর পরের স্তরে জল। সমুদ্র, মহাসমুদ্র, হ্রদ, নদী—জলময় স্তর। এইস্তরের গভীরতা গড়ে ২½ মাইল। তার মানে, পৃথিবীর কোনো সমুদ্র বেশি গভীর, কোন সমুদ্র কম।

আর সব-ওপরে যে-স্তর তাকে আমরা বলি বায়ুমণ্ডল। এর গভীরতা ২০০ মাইল।

এতো কথা জানার পর এইবার ভূমিকম্পের ব্যাপারটা বোঝা সম্ভব হবে।

পৃথিবীর ওপরটা তাপ হারিয়ে শান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ভেতরটা? সেখানে উত্তপ্ত তরল জিনিস বন্দী হয়ে থেকে ঝাঁপিতে-পোরা সাপের মতো রাগে গজরাচ্ছে, আর যেখানে ফাঁক পাচ্ছে সেইখান দিয়েই ঠেলে ওপরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এই গলিত গরম শিলাই জমে হয় আগ্নেয় শিলা।

পৃথিবীতে সব পাহাড়ের বয়েস সমান নয়। এমন অনেক পাহাড় আছে যাদের বয়েস খুব বেশি নয়। এখনও তারা নরমই আছে।

এই যে পৃথিবীর ভেতরটায় তোলপাড় চলছে, এর চাপটা এই কম-বয়েসী পাহাড়দের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। সাধারণ চাপে পাহাড়গুলো বেঁকে দুমড়ে যায়। চাপ আরেকটু

বাড়লে একেবারে ফেটে যায় কিন্তু ফেটে গিয়েও গায়ে-গায়ে লেগে থাকে। তার ওপর আবার চাপ পড়লে এক-দিকের টুকরোটা (টুকরো বলছি বটে, কিন্তু সে কি যে-সে টুকরো !) পিছলে নিচে পড়ে যায়। আর এই পড়ে-যাওয়ার ধাক্কায় মাটি কেঁপে ওঠে। মাটির এই কাঁপনকে বলে ভূমিকম্প।

পৃথিবীর কতটা নিচে এই সব ধাক্কাধাক্কি কাণ্ড চলার জন্য ভূমিকম্প হচ্ছে, আর ধাক্কার ফলে কাঁপনটা কতদূর পর্যন্ত যাচ্ছে, সেই সব খবর বৈজ্ঞানিকেরা বলে দিতে পারেন। যে যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা এই সব খবর জোগান তার একটা ছবি ৭১ পাতায় এঁকে দেওয়া হলো।

প্রকৃতিতে পাথরের তৈরি তোরণ

বন্যায় ডুবে-যাওয়া উপত্যকা
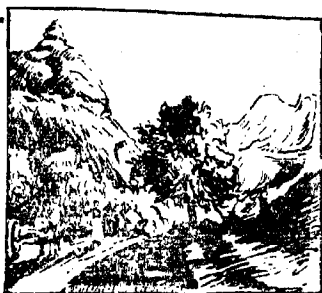
তুষার-সৃষ্ট উপত্যকা
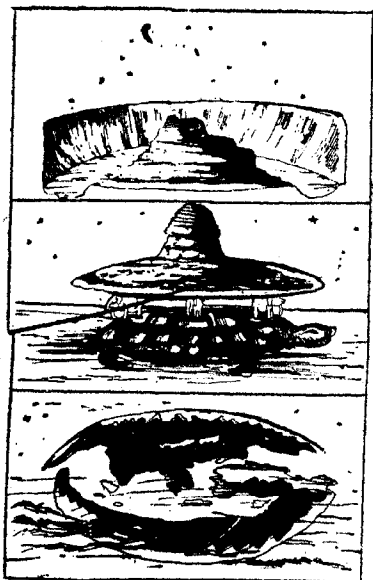
প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ার পণ্ডিতেরা কল্পনা করতেন পৃথিবীটা পোরা রয়েছে এক বিরাট ঘরের মধ্যে, ঘরের পাঁচিল উঠেছে সমুদ্রের ওপর থেকে আর তার ছাদটা তারায় ভরা আকাশ! সবচেয়ে ওপরের ছবিটায় এই কল্পনা। মাঝখানের ছবিতে প্রাচীন মিশরবাসীদের কল্পনা: সমুদ্রে ভাসছে কাছিম, তার পিঠে তিনটে হাতি, তাদের পিঠে পৃথিবী। সবচেয়ে নিচে প্রাচীন গ্রীকদের কল্পনা—যেন একটা থ্যাব্ড়া থালা জলে ভাসছে!
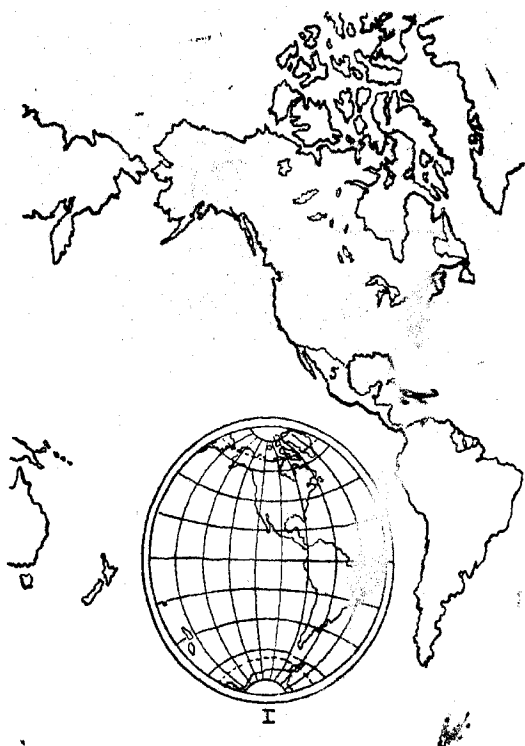
পৃথিবীর এক পিঠের চেহারা। ভূগোলের ভাষায় পূর্বগোলার্ধ।

আর এক পিঠ। পশ্চিম গোলার্ধ। পরের কয়েক পাতায় পৃথিবীর মহাদেশগুলোর ছবি।

উত্তর আমেরিকা

দক্ষিণ আমেরিকা

ইয়োরোপ

আফ্রিকা

এসিয়া

অস্ট্রেলিয়া

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান। পাকিস্তান কালো দাঁড়ি দিয়ে দেখানো হয়েছে।
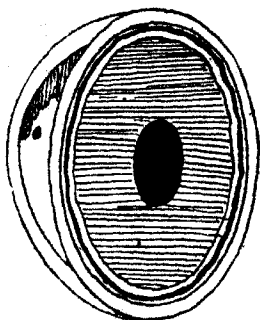
কমলালেবুকে আধাআধি কেটে ফেলার মতো পৃথিবীটাকেও যদি কেটে ফেলা যায়? তাহলে দেখা যাবে সবচেয়ে ভেতরে রয়েছে গলা ধাতু—এই অংশটার ব্যাস ৪০০০ মাইল। ছবিতে এই অংশ-টাকে নিরেট কালো করে দেওয়া হয়েছে। তারপর আর একটা স্তর—লোহা আর নিকেলের সঙ্গে খনিজ জিনিসের মিশেল এই স্তরে। এই স্তর ২০০০ মাইল পুরু। তারপর (একটা খুব পাতলা স্তর পেরিয়ে) মাইল পঁচিশ তিরিশ পুরু পাথুরে স্তর। তারপর জলের স্তর—গড়পড়তায় আড়াই মাইল পুরু। সবচেয়ে বাইরে বায়ুমণ্ডল—প্রায় দুশো মাইল পুরু।

শিলার কথা

পৃথিবীর ভেতরকার নানারকম চাপে পাহাড়গুলোর চেহারার রকমারি হয়ে যায়। ৬৮ আর ৬৯ পাতায় তারই কয়েক রকম নমুনা।
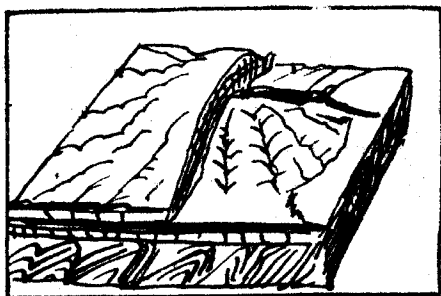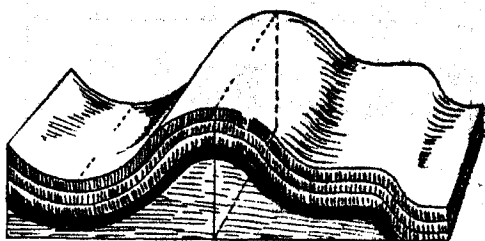
আগ্নেয়গিরি। পৃথিবীর ভেতরকার গলা ধাতু পাহাড় চৌচির করে বেরিয়ে আসছে। এরই দরুন ধ্বসে পড়ে আশপাশের পাহাড়, কেঁপে ওঠে পৃথিবী। তারই নাম ভূমিকম্প।
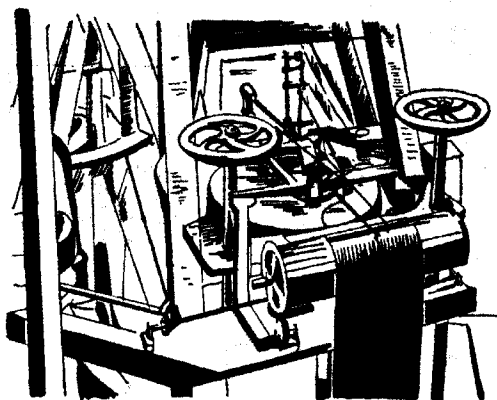
দূর দেশেও যদি ভূমিকম্প হয় তাহলে এই যন্ত্রের কাঁটা কেঁপে উঠবে। কাঁটা কাঁপলে যন্ত্রে লাগানো কাগজটায় কী রকম দাগ পড়ে তার ছবি নিচে। যন্ত্রের নাম সিস্‌মোগ্রাফ,—বলতে পারো ভূমিকম্পের ডিটেক্‌টিভ।
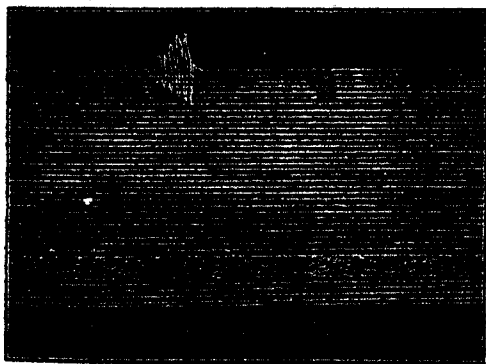
নদী চলে এঁকে বেঁকে, এ-পাড় ভেঙে ও-পাড় গড়ে। তার এই ভাঙা-গড়ার খেলায় বদলে যায় পৃথিবীর ওপরকার চেহারা। পাহাড়ের চুড়ো বা হ্রদ থেকে নদীর উৎপত্তি, নদী ছুটে চলে সমুদ্রের দিকে। চলবার সময় নানান দেশ-ধুয়ে বয়ে নিয়ে চলে বালি নুড়ি আরো কতো কি। সেগুলো গিয়ে জমতে থাকে সমুদ্রের মুখে। গড়ে ওঠে বদ্বীপ।

সুন্দর পৃথিবী। মহাসাগর মহাদেশ, দ্বীপ উপদ্বীপ, সমভূমি পর্বত, আলো অন্ধকার—বিচিত্র সুন্দর পৃথিবী। কিন্তু—

প্রাণ নেই, প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। এতোক্ষণ আমরা দেড়শো কোটি বছরের যে পৃথিবীকে দেখলাম সে পৃথিবী অপূর্ব সুন্দর, কিন্তু প্রাণহীন।

"হে আদিজননী সিন্ধু—"

সমুদ্র আদিজননী। কেননা সমুদ্রই প্রাণের প্রথম জন্মভূমি, পৃথিবীর প্রথম প্রাণের জন্ম সমুদ্রের গর্ভে—সমুদ্রের কুসুম-কুসুম গরম জলে।

প্রাণের জন্ম!

এই পরমাশ্চর্য ঘটনাটি কবে কেমন করে ঘটলো কেউ

জানে না। বিজ্ঞানীদের শুধু এইটুকু অনুমান যে, নানান রকম মৌলিক পদার্থ মিশেল হতে-হতে কোনো একদিন কোনো-এক মিশেল থেকে সমুদ্রের বুকে তৈরি হলো একটা ছড়িয়ে-পড়া, থলথলে, স্বচ্ছ জিনিস। তারই এক-একটি ছোটো-ছোটো কণাই পৃথিবীর প্রথম প্রাণ!

প্রাণকে চিনি কী দিয়ে? প্রাণহীনতার সঙ্গে প্রাণময়তার তফাত কী?

প্রাণ যেন একটা জমাখরচের খাতা। বাইরের থেকে ক্রমাগত খাবার এনে সে নিজের শরীরকে পুষ্ট করছে, আবার অন্যদিকে ক্রমাগতই তার শরীরের ক্ষয় হচ্ছে। জমা আর খরচ, বৃদ্ধি আর ক্ষয়—এই হলো প্রাণের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়।

পৃথিবীর প্রথম এই প্রাণকণাটির দেহেও অবিরাম জমাখরচ।

বৈজ্ঞানিকেরা তার কথা বলতে গিয়ে একটি শব্দ ব্যবহার করছেন: প্রোটোপ্লাজ্‌ম্। তাঁরা বলছেন, পৃথিবীর প্রথম প্রাণকণা প্রোটোপ্লাজ্‌ম্-এর বিন্দু।

প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ কী? প্রাণময় পদার্থ। কিন্তু প্রোটোপ্লাজ্‌মই প্রাণী নয়—যদিও সমস্ত প্রাণীর দেহ প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ দিয়ে তৈরি। অবশ্য আরো সূক্ষ্ম বিচার করলে বোঝা যায় প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ কয়েক রকম মৌলিক পদার্থের মিশেল—কার্বন নাইট্রোজেন ইত্যাদি। ৮৯ পাতায় দেখতে পাবে।

প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ দিয়ে তৈরি সবচেয়ে সূক্ষ্ম যে প্রাণিদেহ, তাকে বলে সেল। ছোটোবড়ো সব প্রাণীর শরীরই সেল দিয়ে তৈরি। বড়ো-বড়ো প্রাণীর দেহে অসংখ্য সেল। প্রত্যেকটি

সেলই একটি জীবন্ত সত্তা।

সেল কেমন দেখতে ?

'সেল' কথাটা ইংরিজি—বাংলায় মানে করলে দাঁড়ায় দেয়াল-ঘেরা ছোটো কুঠরি। বস্তির শ্রমিকদের খুপরির মতো। মাইক্রোসকোপে গাছপালার দেহকে পরীক্ষা করে দেখতে গিয়েই হুক নামে একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ১৬৬৭ সালে সেলের সন্ধান পান। গাছপালার সেল দেখতে ঐ-রকম চৌকো খুপরির মতো। তাই তিনি তাদের নাম দিয়েছিলেন সেল। কিন্তু গাছপালার বদলে তিনি যদি কোনো জন্তুর শরীর পরীক্ষা করতেন তাহলে অমন চৌকো চেহারা দেখতেন না। ছবিতে নানারকম সেলের চেহারা দেখবে।

কিন্তু সমস্ত প্রাণীর শরীরই সেল দিয়ে কীভাবে তৈরি ?

কলকাতারই এক পাড়া মেটিয়াবুরুজ। কারখানার কারিগরদের থাকবার জন্যে সারবন্দি ছোটো-ছোটো খুপরি। আর অনেকটা তফাতে সুরকিঢালা সুন্দর বাগিচার মধ্যে একটি সাজানো বাংলো।

খুপরি আর বাংলো। মাপে আর শৌখিনতায় আসমান-জমিন তফাত। কিন্তু তবু মিল আছে একটা—দুইই ইটের গাঁথনি। ইটেরই প্রাসাদ, ইটেরই খুপরি।

প্রাণীর বেলাতেও অনেকটা সেই রকম। নানান প্রাণীর নানান চেহারা, তবুও শেষ পর্যন্ত সবই সেল দিয়ে তৈরি।

শেষ পাতে একটু টক না হলে নায়েব-মহাশয়ের মুখে ভাত

রোচে না। কচি কচি মৌরলা মাছ দিয়ে নায়েবগিন্নি এক পাথর টক রেঁধে রেখেছেন। কোন্ ফাঁকে এক বেড়াল এসে পাথরকে পাথর সাবাড় করে দিয়ে গেছে।

নায়েবগিন্নি, মৌরলা মাছ, বেড়াল—তিন ভিন জাতের ভিন মাপের প্রাণী। তবু তিনের মধ্যে মিল আছে একটা—প্রত্যেকেরই শরীর সেল দিয়ে তৈরি। সংসারে ছোটো-বড়ো যেখানে যতো প্রাণী আছে সবারই শরীর সেল দিয়ে তৈরি। কারো শরীরে একটিমাত্র সেল, কারো দুটি, কারো অসংখ্য। এবার সেই শুরুর যুগের কথায় ফিরে চলো। নানারকম মৌলিক পদার্থ মিলে তৈরি হলো প্রোটোপ্লাজ্ম্।

প্রথম প্রাণ—একবিন্দু প্রোটোপ্লাজ্ম্। পৃথিবীর প্রথম জীবন্ত জিনিস। বহু যুগ ধরে কতো কতো ধাপ বেয়ে-বেয়ে প্রোটোপ্লাজ্ম্ পেলো সেল-এর রূপ। একটি সেল—একটি প্রাণী।

এই রকম সূক্ষ্ম প্রাণী আজো পাওয়া যায় পানাপুকুরের জলে। তাদের নাম অ্যামিবা। ৯৩ পাতায় একটা অ্যামিবার ছবি দেখো—মাইক্রোসকোপে বড়ো-করে-দেখা চেহারা। অ্যামিবা একটি নিচুস্তরের প্রাণী।

এ কী প্রাণী? হাত নেই পা নেই, মুখ নেই চোখ নেই।

কিন্তু দেখো: পা নেই, তবু খাবার দেখলেই এগিয়ে যায়; মুখ নেই, তবু খায়। ১৩৩ পাতায় দেখতে পাবে।

৯২ পাতায় দেখো, কেমন করে ঐটুকু শরীরটা আস্তে আস্তে

ভেঙে দুখানা হয়ে যাচ্ছে। সেই ভাঙা অংশ দুটোও আবার ভেঙে দুখানা হচ্ছে।

প্যারামীসিয়াম্ বলে একটা খুব-ছোটো একসেলওয়ালা প্রাণী আছে। আজ যদি একটা বাটির মধ্যে একটা প্যারামীসিয়াম্ ছেড়ে দিই, সাত দিন পরে দেখবো বাটিটায় কিলবিল করছে ঐ-রকম ১০ লক্ষ জীব। সেল এইভাবেই একটা থেকে দুটো, তার থেকে চারটে, তার থেকে আটটা হয়ে চক্ষের নিমেষে বংশ বাড়িয়ে চলে।

এই হলো সেলের গড়ন আর তার বংশবিস্তারের ধারা।

ওরা যে বেঁচে আছে, এই তো তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। ওরা আত্মরক্ষা করছে, খেয়ে নিজেদের টিকিয়ে রাখছে; ওরা বংশরক্ষা করছে, নিজেদের শরীর থেকে নিজেদেরই মতো নতুন প্রাণীর জন্ম দিয়ে নিজেদের বংশকে বাড়িয়ে যাচ্ছে।

জীবনের দুটি বড়ো কাজ—আত্মরক্ষা আর বংশরক্ষা। তা ওরা পারে। তাই যতো ছোটোই হোক, ওরা প্রাণী।

প্রথম যুগে শুধু ওই রকম এক-সেল-এর প্রাণী।

তারপর, লক্ষ কোটি বছর ধরে প্রাণের রাজ্যে ক্রমাগত পরিবর্তন চলছে। এক-সেলের প্রাণী থেকে ক্রমশ বহু-সেলের প্রাণী হয়েছে। বৈচিত্র্য এসেছে, প্রাণীদের শরীরে নানান জটিলতা এসেছে। নতুন নতুন জীব এসেছে যারা চারপাশের জল-বাতাসের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে টিঁকে থাকার জন্যে শরীরে তৈরি করেছে নতুন নতুন অঙ্গ। নতুন নতুন জীব এসেছে যাদের অনুভবশক্তি অনেক বেশি, বুদ্ধির বহর অনেক বড়ো।

এইভাবে ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে প্রাণের অভিযান। এর চেয়ে রোমাঞ্চকর গল্প কোথাও নেই।

আর প্রাণের জগতে সবচেয়ে সেরা সৃষ্টি মানুষ, যে মানুষ তার মাথা আর হাতের জোরে প্রকৃতিকে মুঠোর মধ্যে এনেছে, যে মানুষের এতো বড়ো অহঙ্কার যে আমি পৃথিবীকে জানতে পারি, আর আমি পারি পৃথিবীকে বদলে দিতে!

কিন্তু উন্নতির ধারাটা কি বুঝলাম? কোন্ জীব আগে এসেছে? কে কার পরে? এদের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে? এই আগে-পরে আসার কি কোনো নিয়ম আছে?

এ-সব প্রশ্নের জবাব পাবো কোথা থেকে?

একটা জবাব আছে ধর্মপুস্তকে। যেমন ধরো বাইবেলে: "কোনো-এক শুভদিনে" ভগবান নানান জাতের প্রাণীর নমুনা সৃষ্টি করে পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। [illegible] মধ্যে দুজন মানুষও ছিলো। ক্রমে ক্রমে তাদের ছেলে[illegible]তে সংসার ভরে গেলো।

আরেক রকম জবাব আছে হিন্দুদের ধর্মপুস্তকে—ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ব্রহ্মার জন্ম হলো। ব্রহ্মা তপস্যায় বসলেন। তপস্যাবলে ব্রহ্মার শরীরের এক-এক অঙ্গ থেকে এক-এক জীবের সৃষ্টি হলো।

ধর্মের জবাব সবই এক রকম—কোনো এক অলৌকিক উপায়ে হঠাৎ একসঙ্গে সব হয়ে গেলো।

বিজ্ঞানের জবাব একেবারে উলটো। বিজ্ঞান বলছে—ক্রমবিবর্তন। মানে, ক্রমশ-ক্রমশ পরিবর্তন।

বিজ্ঞান বলছে, সব এক মন্তরে হয়নি, ক্রমে ক্রমে হয়েছে, একটা বদলে আরেকটা হয়েছে।

আর যদি তাই হয়, একটা বদলে যদি আর এক রকম প্রাণী হয়, তাহলে আজকের দিনে রকমারি প্রাণীকে দেখতে যতোই আলাদা-আলাদা হোক না কেন, তাদের সবাইকার মধ্যে সম্পর্ক আছে। বংশের সম্পর্ক।

"আমাদের এই গ্রহ যেমন মহাকর্ষের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ক্রমাগত আবর্তিত হয়ে চলেছে, ঠিক তেমনি খুব সামান্য একটি সূচনা থেকে সবচেয়ে সুন্দর সব-চেয়ে আশ্চর্যের অসংখ্য রূপ ক্রমাগত আবর্তিত হয়েছে; আজো আবর্তিত হয়ে চলেছে।" চার্লস্ ডারউইন।

আমরা কার কথা মানবো? ধর্মের কথা, না বিজ্ঞানের কথা?

যে সঠিক প্রমাণ দিতে পারবে আমরা তার কথাই মানবো।

বিজ্ঞানই দিচ্ছে সঠিক প্রমাণ। অনেক প্রমাণ।

প্রমাণগুলো সব-প্রথম জোগাড় করলেন কে?

তাঁর নাম ডারউইন্।

"আমার নাম চার্লস ডারউইন। জন্ম ১৮০৯ সালে। আমি খুব খুঁটিয়ে দেখতাম। জাহাজে চেপে একবার সারা পৃথিবীটা ঘুরে এসেছিলাম। তারপর আমি আবার তলিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলাম।"

একজন তাঁর আত্মজীবনী শুনতে চাইলে ডারউইন এই সামান্য কয়েকটি কথায় নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই সামান্য কটি কথাতেই ডারউইনের জীবনের সবটুকু পরিচয় ধরা পড়েছে। তার মধ্যে একটা কথা একেবারে সার কথা—পরীক্ষা। খুঁটিয়ে দেখা।

ইস্কুলের পড়ায় ডারউইনের মন ছিলো না। তিনি পড়তে ভালোবাসতেন সেই সব বই যাতে জীবজন্তুর, পোকা-মাকড়ের গল্প আছে। আর তিনি ঘুরে বেড়াতেন মাঠে জঙ্গলে নদীর ধারে। নানারকম পোকামাকড় ধরে আনতেন সেইসব জায়গা থেকে। আর দেখতেন—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন তারা কী করে, কেমন করে খায়, কেমন করে বাচ্চা পাড়ে।

পাশ করার পর বাবা তাঁকে পাঠালেন ডাক্তারি পড়তে। কিন্তু ডাক্তারিতেও তাঁর মন বসলো না। অগত্যা বাবা কী করেন? বললেন, যাও পাদরি হবার কলেজে গিয়ে ঢোকো। কী আর করবে? লোককে ধর্মকথা শোনাবে।

কিন্তু ডারউইনের কলেজ ছিলো ভেড়া-চরা মাঠে—নতুন নতুন গাছ, পাখি, পোকামাকড়ের মধ্যে। প্রকৃতির কলেজ—ডার-

উইনের আসল লেখাপড়া সেইখানেই। নিজেই নিজের মাষ্টার।

একুশ বছর যখন বয়েস, তখন ডারউইনের বরাত গেলো খুলে। "বীগল" বলে একটা জাহাজ পৃথিবীভ্রমণে বেরোবে। উদ্দেশ্য—ব্যবসাবাণিজ্যের নতুন রাস্তা বার করা। জাহাজের ক্যাপটেনের ইচ্ছে—একজন বৈজ্ঞানিক সঙ্গে থাকুক, সে দেশবিদেশের নানান খবরাখবর সংগ্রহ করে আনবে।

পাঁচ বছর ধরে "বীগল" সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ালো। জাহাজ যেখানেই আসে, ডাঙায় নেমে ডারউইন সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। ভারি মজার-মজার জিনিস তাঁর চোখে পড়ে। দেখেন, একই গাছ—আফ্রিকার কাছের দ্বীপগুলোতে এক রকম, আমেরিকার দ্বীপগুলোতে একটু অন্য রকম। অথচ একই গাছ। এক দেশে দেখেন, একই জন্তু—কিন্তু যেগুলো এখন চলে ফিরে বেড়াচ্ছে সেগুলো দেখতে ছোটো আর তাদের যে পূর্বপুরুষদের কঙ্কাল মাটির নিচে পাথর হয়ে আছে সেগুলো অনেক বড়ো। ডারউইন এইসব দেখেন আর ভাবেন। ভাবেন, এদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি না।

এক জায়গায় দেখলেন একটা মরা জন্তুর কঙ্কাল। এখনকার দিনের অনেকগুলো জন্তুর সঙ্গে তার মিল দেখা যায়, অনেকগুলো জন্তুর শরীর যেন সেই-একটা জন্তুর শরীরে এসে জটলা পাকিয়েছে। রেলরাস্তায় যেমন থাকে জংশন ইষ্টিশান, নানান দিকে লাইন বেরিয়ে গেছে, এই আগেকার দিনের জন্তুও যেন তেমনি জংশনের জন্তু, এর থেকে নানান জাতের জন্তু নানান রাস্তায় চলে গেছে।

কিছুই ডারউইনের চোখ এড়ায় না। যা দেখেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখে যান পাতার পর পাতা, খাতার পর খাতা।

এইসব দেখতে দেখতে, আর দেখে ভাবতে ভাবতে, ডারউইনের মনে এই ধারণা হলো যে, এই প্রাণের রাজ্যে কোনো প্রাণীই আলাদা আলাদা নয়, প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে, এক-একটি প্রাণী যেন একই বইয়ের আলাদা এক-একখানা পাতা।

পাঁচ বছর পরে পাঁজা-পাঁজা খাতা নিয়ে ডারউইন জাহাজ থেকে নামলেন। জীবজগৎ সম্বন্ধে এতো জ্ঞান তখন আর কার ছিলো বলো? কিন্তু তবু তিনি মনে করলেন, যথেষ্ট দেখা হয় নি, আরো খুঁটিয়ে দেখতে হবে—পুরো শিক্ষার এখনো অনেক বাকি! আরো খুঁটিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন, আরো গাছপালা জন্তুজানোয়ার নিয়ে গভীর পরীক্ষা করতে লাগলেন, —আরো তেইশ বছর ধরে।

একেই বলে সত্যিকার জ্ঞানপিপাসা। এরই নাম বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা।

অবশেষে ২৩ বছর পরে ডারউইনের বই ছাপা হয়ে বেরোলো। আর শুনবে? একদিনেই সেই বই সব বিক্রি হয়ে গেলো। তারপর সারা পৃথিবীতে সে কি শোরগোল! পাদ্রি-পুরুতরা তো রেগে অগ্নিশর্মা! কেন, তা তো বুঝতেই পারছো। বাইবেলে বলেছে ভগবান সব জীব সৃষ্টি করেছেন রাতারাতি। আর ডারউইন হাতেকলমে প্রমাণ করে দিলেন, ওসব একদম বাজে কথা। আসল কথা, ধাপে ধাপে পরিবর্তন।

এক-এক ধাপে প্রাণী নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নতুন নতুন গুণ নতুন নতুন শক্তি লাভ করেছে, শরীরে নতুন অঙ্গ তৈরি করে নিয়েছে। এই নতুন গুণ নতুন শক্তি অর্জন, নতুন অঙ্গ নির্মাণ হলো সব পরিবর্তনের সব উন্নতির আসল কথা। একেবারে গোড়াকার কথা।

কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলি।

মাছ থাকে জলে। জল যদি শুকিয়ে যায়? মাছ হয় খাবি খেতে-খেতে মরবে আর নয় তো ডাঙায় উঠতে চাইবে বাঁচবার জন্যে। কিন্তু ডাঙায় উঠে বাঁচতে হলে নিশ্বাস নিতে পারা চাই। নিশ্বাস নিতে গেলে ফুসফুস চাই—যাদেরই বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে হয় তাদেরই ফুসফুস চাই। যে-সব মাছ ফুসফুস বানিয়ে নিতে পারলো তারাই ডাঙায় উঠে বাঁচলো, যারা পারলো না তারা মরলো।

কিন্তু এইভাবে যারা বাঁচলো তারা আর মাছ রইলো না। বদলে গেলো।

এককালে পৃথিবীতে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড চেহারার এক রকম জন্তু বাস করতো। কী বিরাট বপু তাদের—এক-একটার ওজন ৪০০।৫০০ মন। দোতলা-সমান উঁচু গলা ছিলো তাদের। তাদের নাম ডাইনোসার।

আজকাল আর তাদের দেখা যায় না—বহু যুগ আগে তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কেন তারা টিকতে পারলো না? কারণ তারা ছিলো গরম, জোলো আবহাওয়ার জন্তু। হঠাৎ পৃথিবীতে দারুণ পরিবর্তন

এলো। খালবিল নদীনালা সমুদ্র সব শুকিয়ে খাঁ-খাঁ করতে লাগলো, আর উত্তর দিক থেকে বইতে লাগলো রক্তজমানো কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। এই নতুন অবস্থায় টিকে থাকতে হলে চাই নতুন গুণ, নতুন শক্তি। সেই নতুন শক্তির পরিচয় এই ডাইনোসার জাতের জন্তুরা দিতে পারলো না। তাই তাদের বংশ উজাড় হয়ে গেলো।

যুগে যুগে পৃথিবী যেন নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে হাজির হয়েছে: দেখি কতো গরম সইতে পারো, দেখি শুকনো হাওয়ায় বাঁচতে পারো কিনা। যে-প্রাণী বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, বলেছে 'এই দেখো, পারি', সেই টিঁকতে পেরেছে, নতুন আক্রমণকে সে নতুন অস্ত্র দিয়ে রুখেছে। সে বেঁচে গেছে, কিন্তু টিঁকতে গিয়ে বদলে গেছে।

কিন্তু এ-সব কথার যুক্তিটা কী? ধর্ম মনগড়া কথা বলে। ডারউইন যে বিজ্ঞানের ধোঁকা দিয়ে বানিয়ে-বানিয়ে অবৈজ্ঞানিক কথা বললেন না, তার প্রমাণ পাবো কোথায়?

প্রমাণ অসংখ্য।

প্রমাণ পেতে চাও তো প্রাণীর একেবারে গোড়ায় চলে যাও, যখন সে মায়ের পেটে বা ডিমের মধ্যে। দেখবে, মানুষই বলো, ব্যাঙই বলো, মুরগিই বলো, কুকুরই বলো—দেখতে সবাই মাছের পোনার মতো। তারপর যতোই বড়ো হতে থাকে, চেহারায় আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে থাকে। তার মানে, মাছের সঙ্গে এদের সবাইয়েরই সম্পর্ক আছে।

আরো দেখবে : মায়ের পেটে থাকবার সময় মানুষের বাচ্চারও বাঁদরের মতো লেজ গজায়, খরগোসের মতো সারা শরীরটা নরম লোমে ভরে থাকে। সে-লেজ যায় কোথায় ? খসে যায়। অতো লোমের কী হয় ? উঠে যায়। শুধু লেজের প্রমাণ হিসেবে শিরদাঁড়ার নিচে থেকে যায় শক্ত হাড়টা।

আরো প্রমাণ পেতে চাও তো প্রাণীর শরীরের ওপরের খোলোসটা খুলে ফেলে ভেতরের কাঠামোটা খুঁটিয়ে দেখো। ব্যাঙের কঙ্কাল, বাঁদরের কঙ্কাল আর মানুষের কঙ্কাল—খুব বেশি তফাত নজরে পড়ে কি ?

আরো প্রমাণ চাও তো হাতে কোদাল ধরতে হবে। কারণ সে-সব প্রমাণ হলো পাথুরে প্রমাণ, পাথর কেটে কেটে উদ্ধার করতে হবে।

পাললিক শিলার কথা বলেছি। এক-এক থাক পলি পড়ে এই শিলা তৈরি হয়েছে। ওপরকার থাকের চাপে পড়ে নিচের থাকের নরম মাটি ক্রমশ পাথর বা শিলা হয়ে গেছে। পণ্ডিতেরা নানান রকম হিসেব করে বলে দিতে পারেন কোন

থাক কতোদিনের পুরনো।

সেই পাললিক শিলার থাকে থাকে পাওয়া যায় জীবজন্তুর বা উদ্ভিদের ছাপ। শিলমোহরের ছাপের মতোন। কিন্তু এইসব ছাপ পড়লো কেমন করে? মাটির সঙ্গে মরা জন্তুর হাড়গোড়-কঙ্কাল, গাছের গুঁড়ি-পাতা তো থাকেই। প্রথম প্রথম মাটি নরম থাকে। তারপর পরের পর নতুন নতুন থাক পড়তে পড়তে নিচের দিকের থাকটা জমাট বেঁধে শক্ত পাথর বা শিলা হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই থাকের ওপর জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ বা গাছপাতার চেহারাটা ছাপ রেখে যায়। এই ছাপ-হয়ে-যাওয়া জীবজন্তুর নাম ফসিল।

এই ফসিলগুলিই বলে দেয়, পৃথিবীতে কোন সময় কোন ধরনের জীব বাস করতো।

একেবারে পাললিক শিলার সবচেয়ে নিচের যেটা থাক, সেইটারই তো বয়সে সবচেয়ে পুরনো। সেই থাকে যে-সব জীবজন্তুর ফসিল পাওয়া যাবে, বুঝতে হবে সেই সময়ে পৃথিবীতে সেইসব জীবজন্তুই ছিলো।

এইভাবে পাললিক শিলার একেবারে নিচের থাক থেকে ক্রমশ উঠতে উঠতে একেবারে ওপরে উঠে এসো, আর উঠে আসার সময় তোমার ঝুলিতে প্রত্যেক থাকের কয়েকটা করে ফসিল পুরে নাও। তারপর একটা বড়ো টেবিলে প্রত্যেক থাকের ফসিল নিচের থেকে ওপর পর-পর সাজিয়ে রাখো। কী দেখবে?

সব-নিচু থাকের ফসিলে দেখবে কেবল এক-সেলওয়ালা

জীবদের ছাপ। তারপর বহু-সেলওয়ালারা, তাদের মধ্যে পোকামাকড় কিছু কিছু আছে। তারপরের থাকের ফসিলে দেখি শিরদাঁড়াওয়ালা আর অন্যান্য জলজন্তুর ছাপ। তারপর পাথরে ছাপ ফেলেছে যারা বুকে হেঁটে চলে। তারপর আধুনিক যুগ : ফসিলে দেখি নানারকম পাখি আর আরো স্তন্যপায়ী জীবের ছাপ।

তিনটে প্রমাণের কথা বললাম : পাথরের প্রমাণ, কঙ্কালের প্রমাণ, মায়ের পেটের ভেতরের বা ডিমের ভেতরের চেহারার প্রমাণ। আরো অনেক প্রমাণ আছে। এইসব প্রমাণ মিলিয়ে বিজ্ঞান বলছে, জীবজগতের ক্রমোন্নতির একটা ধারা আছে, নিয়ম আছে।

শুধু জীবজন্তুর কথাই বললাম। গাছগাছড়াদের বেলাতেও এই রকম—যুগের পর যুগ ধরে একের পর এক পরিবর্তন।

সে আবার আর এক গল্প।

ডারউইনের চেষ্টায় পরিবর্তনের নিয়মটা বোঝা গেলো—অজানা জিনিস জানা হলো।

তাতেই কি সব কাজ শেষ হলো ?

না। কোনো-কোনো বৈজ্ঞানিক বললেন, এইবার কাজ শুরু হলো।

রুশদেশের একজন বৈজ্ঞানিক গাছপালাদের নিয়ে সত্যি-সত্যিই কাজ শুরু করে দিলেন। তাঁর নাম মিচুরিন। মিচুরিন বললেন, জীবজগতে পরিবর্তনের নিয়মটা যখন জানলাম তখন

কেন খারাপ গাছকে বদলে ভালো গাছ করা যাবে না? গাছের ফলন কেন বাড়ানো যাবে না? ছোটো আঙুরের জায়গায় বড়ো আঙুর কেন ফলবে না? একফলা গাছ দোফলা কেন হবে না? নিশ্চয়ই হবে। মিচুরিন নিজে হাতেকলমে কাজ করে সমস্ত পৃথিবীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—হয়, হবে।

এই হলো নিয়ম শেখা। প্রকৃতির এই নিয়মকানুনগুলো আমরা জানতে পারি। কিন্তু তাই বলে ইচ্ছে করলেই সেসব নিয়ম উড়িয়ে দিতে পারি না। কেননা এই সব নিয়মকানুনগুলো মানুষের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না। মানুষ তবুও তাকে নিজের কাজে লাগাতে পারে। সেটাই হলো বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। নিয়ম শিখে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার করে বেড়ানো নয়—নিয়মকে কাজে লাগাতে হবে, খোদার ওপর খোদকারি করতে হবে, প্রকৃতিকে বদলে দিতে হবে।

প্রকৃতিকে বদলে দিতে হবে, পৃথিবীকে আরো সুন্দর, আরো আনন্দময় করে তুলতে হবে—আমাদের মনে হয় ডারউইন পড়ার এই হলো আসল শিক্ষা।
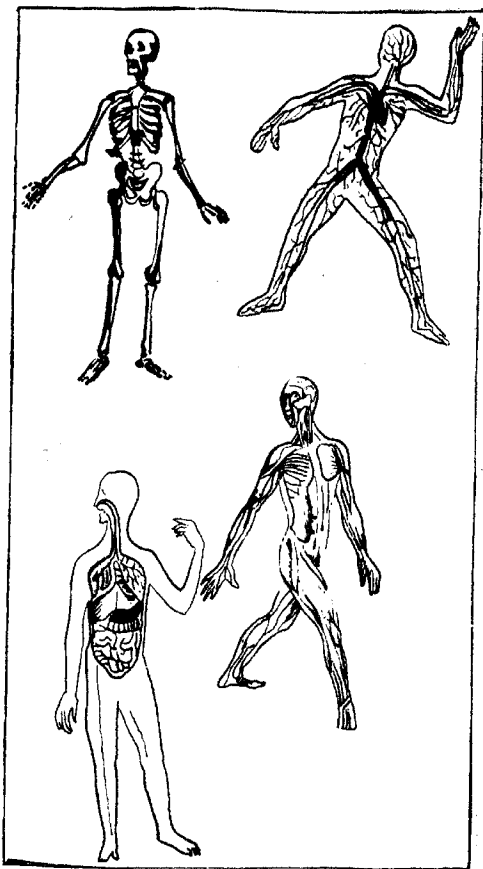
পশুরাজ মানুষ। কোথা থেকে এলো?
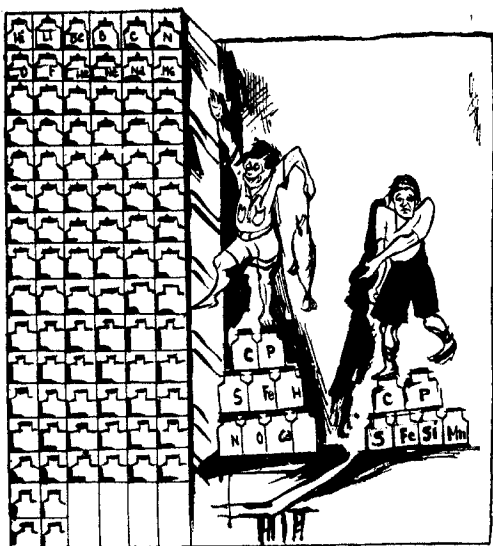
প্রকৃতির ভাঁড়ারঘর। এই ভাঁড়ারে সবশুদ্ধ ৯২ রকম জিনিস আছে—কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আরো কত গালভরা নাম। পণ্ডিতেরা সংক্ষেপে সারবার আশায় এগুলোর ডাকনাম দিয়েছেন: C, P, S, Fe, Si, Mn., ইত্যাদি। এই ৯২ রকম মালমশলা দিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস তৈরি। ওঁদের ভাষায় এগুলো তাই মৌলিক পদার্থ। যে সব মৌলিক পদার্থ দিয়ে মাছ তৈরি আর যা দিয়ে লোহার খাঁড়া তৈরি সেগুলোর ডাকনামের নমুনা বোতলের গায়ে।

হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে এই সব মৌলিক জিনিসের কয়েকটা মিশেল খেতে খেতে তৈরি হলো জীবন্ত পদার্থ। তখন থেকেই পৃথিবীতে প্রাণের ইতিহাস শুরু।
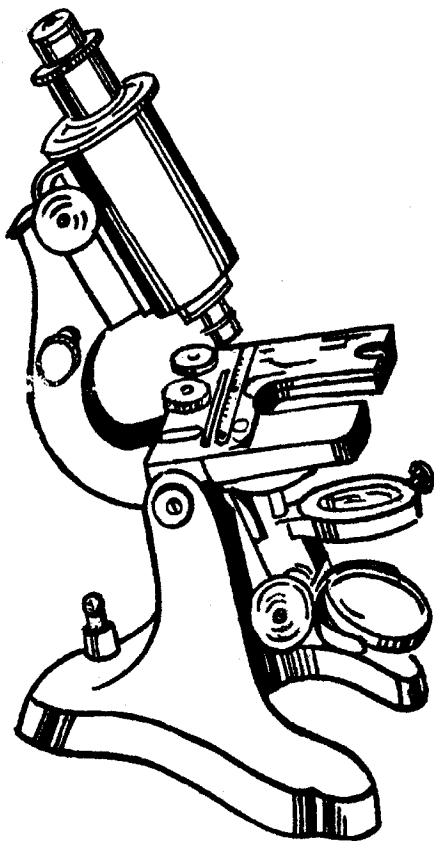
অণুবীক্ষণ যন্ত্র। শুধু চোখে দেখতে পাওয়া যায় না এমন ছোটো জিনিসকেও এই যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে বড়ো করে দেখা যায়।
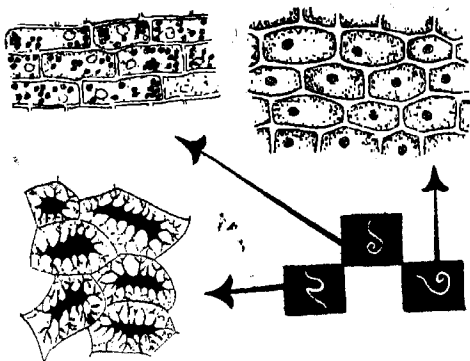
সমস্ত রকম জীবন্ত জিনিসই শেষ পর্যন্ত 'সেল' বলে অতি-সূক্ষ্ম অংশ দিয়ে গড়া। ওপরের ছবিতে: (১) পাম পাতার সেল, (২) পেঁয়াজের সেল, (৩) পীচফলের সেল।
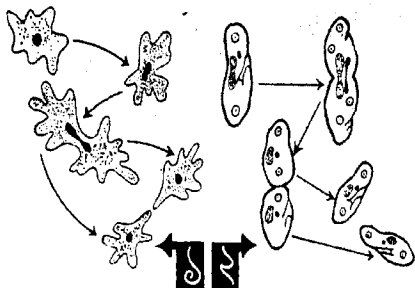
একটি সেল দুভাগ হয়ে জন্ম দেয় দুটি সেল-এর। ওপরের ছবিতে দেখো। নিচের ছবিতে দেখা যাচ্ছে এইভাবে একটি থেকে বহু সেল-এর জন্ম হয়েছে আর তারা কীভাবে ঝাঁক বেঁধেছে।
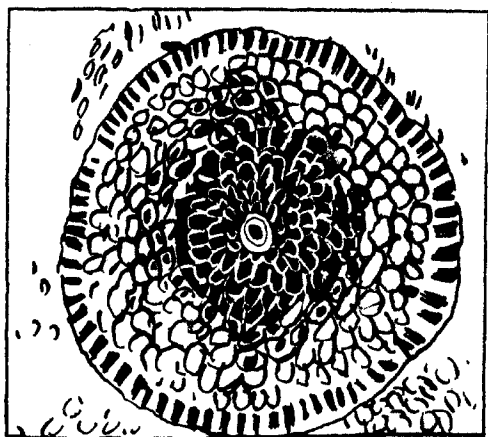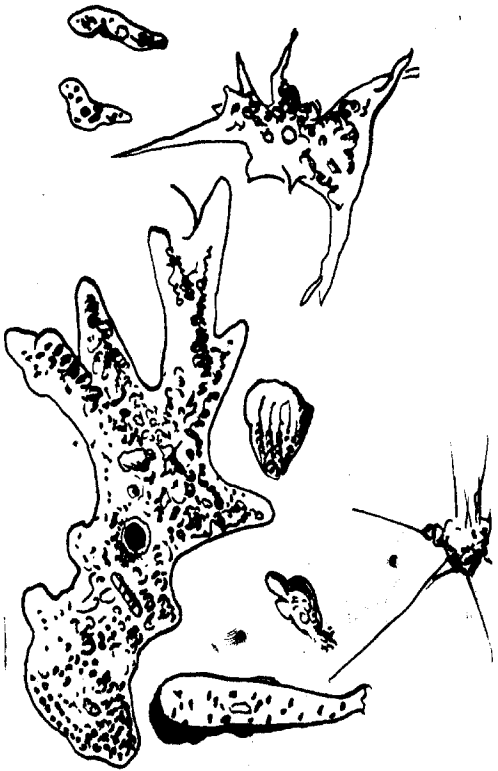
এঁদের নাম অ্যামিবা। বহুত বড়ো করে আঁকা হয়েছে।
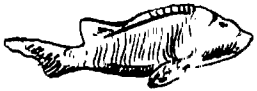
এঁদের নাম অস্ট্রাকোডার্ম। এঁরা হলেন মানুষের খুব পুরোনো পূর্বপুরুষ! আসলে একরকম আদ্যিকালের মাছ। তারপরের ছবিতে পৃথিবীর আদিম উভচর। তারপরের ছবিতে কয়েক রকম আধুনিক সরীসৃপ।
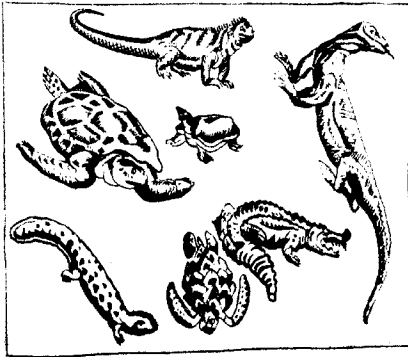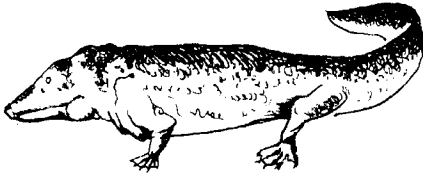
ডিম ফুটে কুমির-ছানা বেড়িয়ে পড়ছেন। এঁরা আজকালকার সরীসৃপ। আর নিচের ছবিতে অতীত যুগের কয়েক রকম অতিকায় সরীসৃপ। ডাইনোসার। সুখের বিষয় এঁরা পৃথিবীর বুক থেকে লোপ পেয়েছেন।
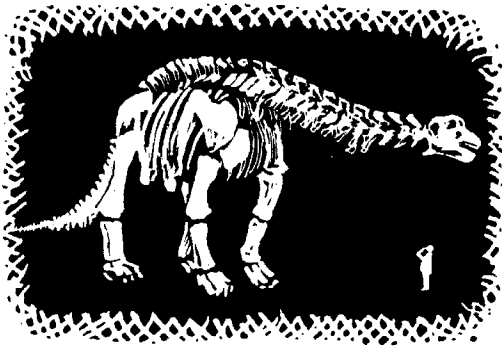
অতিকায় ডাইনোসারের কঙ্কাল। যাদুঘরে দেখতে পাবে। ওরা ছিলো গরম আর জোলো আবহাওয়ার জীব। পৃথিবীতে যখন বরফ-যুগ এলো তখন ওরা সাওয়ায় মারা গেলো। নিচের ছবিতে বরফ-যুগের মানচিত্র : কালো অংশটুকু ছাড়া সবটাই বরফে ঢাকা।

এঁদের বলে স্তন্যপায়ী। ছবিতে দেখো, প্রত্যেকেই নিজের খোকাখুকু নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন।
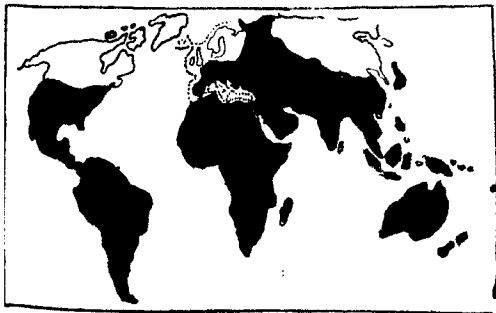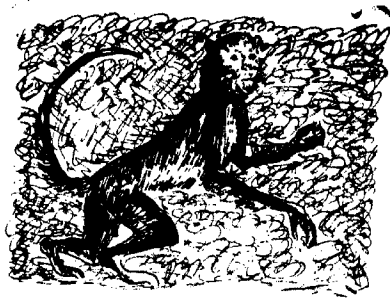
ওপরের ছবিতে প্রাইমেট। আর নিচের ছবিতে সিম্পাঞ্জী, আদিম মানুষ ও আজকের মানুষের মগজের মাপের আর গড়নের তফাত দেখানো হয়েছে।
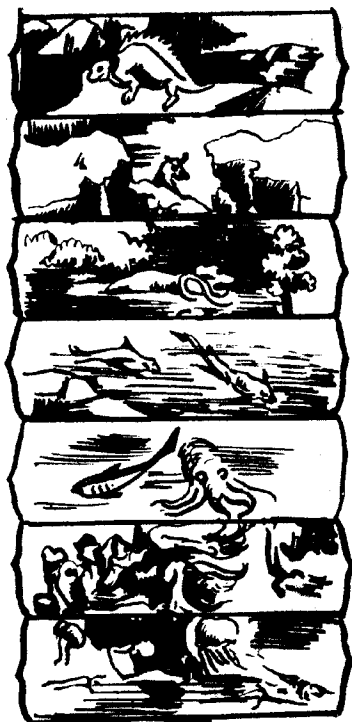
চোদ্দ অধ্যায়ে প্রাণের গল্প। এ-পাতায় তার সাতটি অধ্যায়। এ-গল্প পড়বার কায়দা কিন্তু নিচের থেকে ওপরে, সিঁড়িভাঙা অঙ্কর মতোন।
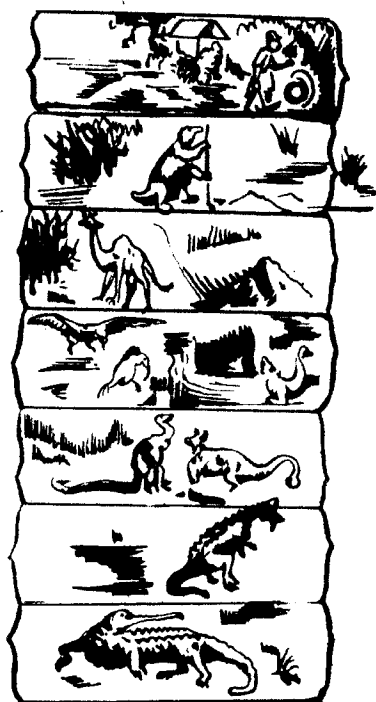
পরের সাতটি অধ্যায়। তলার দিক থেকে ওপরের দিকে উঠছো—মনে আছে তো? এ-গল্প যে সত্যি তার প্রমাণ? পরের পাতা থেকে প্রমাণ শুরু হচ্ছে।
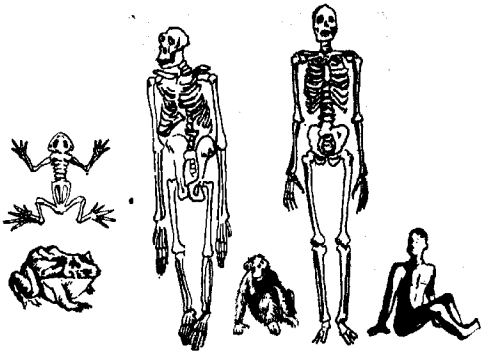
ব্যাঙ, গোরিলা আর মানুষ—কঙ্কালের চেহারায় কিন্তু খুব বেশি তফাত নয়। নিচের ছবিতে দেখো, চার রকম জানোয়ারের হাড়ের গড়ন অনেকটা একই রকম। [illegible]লের মিল বা হাড়ের মিল থেকেই প্রমাণ, প্রাণীগুলোর মধ্যে অ[illegible]ত্মীয়তা আছে।
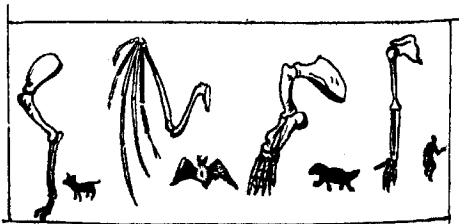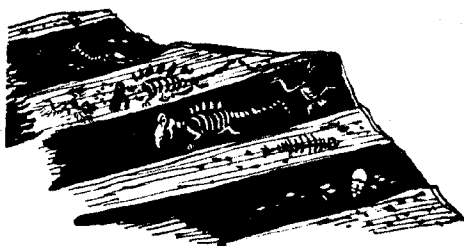
ওপরে পাললিক শিলা : নানান স্তরে নানান যুগের ফসিল।
নিচের ছবিতে ফসিলের নমুনা।
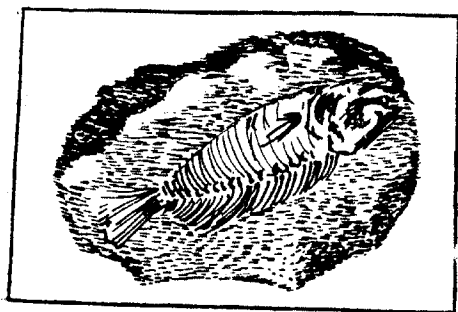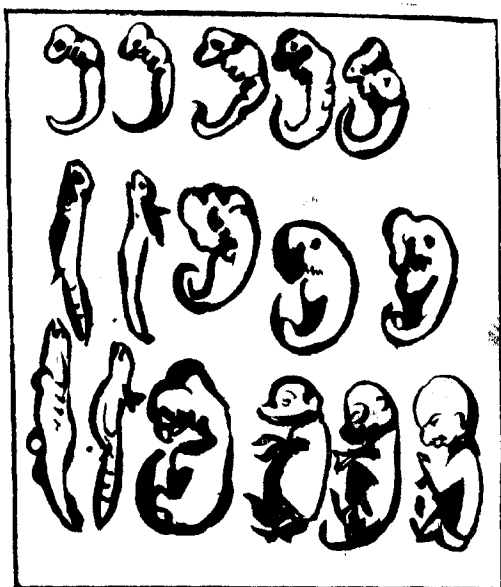
জন্মাবার আগে মাছ, মুরগি বা বাঁদরের বাচ্চার সঙ্গে মানুষের বাচ্চার খুব বেশি তফাত নেই। তার থেকে কী প্রমাণ হয়?
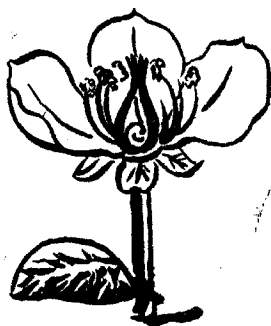
পৃথিবীর প্রথম প্রাণের জন্ম সমুদ্রে।

বারবার শুনতে শুনতে কথাটা নিশ্চয়ই তোমার মনে চিরদিনের মতো গেঁথে গেছে।

কিন্তু এবার যে কথাটা বলবো, একবার শুনেই চিরদিন মনে রাখতে চেষ্টা কোরো: সমুদ্রের বুকের সব-প্রথম প্রাণীটি কোনো জন্তু নয়—সেটি একটি গাছ। উদ্ভিদ। অবশ্য গাছ বলতেই ডালপালা-মেলা ফুলে-ফলে-ভরা যে জিনিসটি আমাদের মনে পড়ে, সেই প্রথম প্রাণীটি—প্রথম গাছটি—তেমন কিছুই নয়। গাছ বলতে না চাও, গাছের ক্ষুদ্রতম অঙ্কুর তাকে বলতেই হবে। সেই অঙ্কুরই ধাপে ধাপে পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতির জন্ম দিয়েছে।

ছোটো ছেলের মুখে যখন কথা ফোটে, তখন তার সম্বল দুটি কি তিনটি কথা। যতোই সে বড়ো হয়, জ্ঞান বাড়ে,

নানান জাতের গাছ

অনুভবশক্তি বাড়ে, ততোই তাকে নতুন নতুন কথা শিখে নিতে হয়। নইলে সে নিজেকে প্রকাশ করবে কী করে?

প্রাণী—এই একটিমাত্র কথা দিয়ে এতোক্ষণ আমরা কাজ চালিয়ে এসেছি। যারই প্রাণ আছে সেই প্রাণী। কিন্তু একটিমাত্র কথায় আর কাজ চলতে চাইছে না। কেননা, আমাদের জ্ঞান বেড়েছে। আমরা শিখেছি, প্রাণের মহারাজ্যে দুটি রাজ্য আছে, ভারতবর্ষে যেমন ২৯টি প্রদেশ আছে। এক, গাছপালার রাজ্য। দুই, জীবজন্তুর রাজ্য। দুটি রাজ্যের দুটি আলাদা নাম না হলে চলে কি? নাম দেওয়া গেলো—উদ্ভিদ, উদ্ভিদ-জগৎ; প্রাণী, প্রাণিজগৎ। শেষের শব্দে ই-কার হলো সংস্কৃত সমাসের নিয়মে।

উদ্ভিদ আর প্রাণী।

মিল কিসে? না, দুজনেরই প্রাণ আছে। ঠিক।

জিগগেস করলাম, তফাতটা কী?

তুমি বললে, উদ্ভিদ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, প্রাণী অনেক দূর পর্যন্ত নড়াচড়া করতে পারে। তাও ঠিক।

আর কী?

তুমি জবাব দিলে, গাছ—থুড়ি—উদ্ভিদ সবুজ।

কেন সবুজ?

এবার আমাকেই জবাব দিতে হবে: উদ্ভিদে ক্লোরোফিল আছে। ক্লোরোফিল সবুজ, তাই উদ্ভিদও সবুজ।

এবার তোমার প্রশ্ন: ক্লোরোফিল কাকে বলে?

আমার জবাব : উদ্ভিদের শরীরে সেল-বিশেষে ক্লোরোফিল নামে সবুজ রঙের একটি পদার্থ আছে। তারই রঙে গাছকে সবুজ দেখায়।

আরো তফাত আছে। আপাতত আর-একটির কথা জেনে রাখা যাক। উদ্ভিদের সেলগুলোর মাঝে-মাঝে দেওয়াল আছে। সেগুলো সেলুলোজ নামের একটা শক্ত জিনিস দিয়ে তৈরি। এই সেলুলোজ প্রাণীর দেহের সেলে নেই।

উদ্ভিদ আর প্রাণী।

প্রাণের মহারাজ্যে উদ্ভিদরা এসেছে প্রথমে। তারা বড়ো ভাই। আর মা-বাবা বুড়ো হয়ে পড়লে ছোটো ভাই যেমন বড়ো ভাইকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকে, বড়ো হয়ে ওঠে, তেমনি উদ্ভিদদের আশ্রয় করেই প্রাণীরা বেঁচে আছে, বড়ো হয়ে উঠছে।

তার মানে ?

তার মানে, উদ্ভিদরাই চিরটাকাল প্রাণীদের মুখে খাবার জুগিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত উদ্ভিদ-রাজ্যটা যেন এক বিরাট অতিথ-শালা। সব প্রাণী, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ, সেই অতিথশালার —দুদিনের নয়—চিরদিনের অতিথি।

কিন্তু এই-যে দাতাকর্ণ হয়ে বসে আছে উদ্ভিদ, এতো ধন-দৌলত সে কোথায় পেলো ?

নিজের রোজগার তার বেশি নয়, তার এতো দাতাগিরি গৌরীসেনের টাকায়।

সেই গৌরীসেন—সূর্য।

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি।

স্বাস্থ্যের বইতে পড়েছো, স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে পাঁচ রকমের খাদ্য খেতে হয় : প্রোটিন, শ্বেতসার (কার্বো-হাইড্রেট), চর্বি, লবণ, জল। প্রোটিন শরীরের ক্ষয়পূরণ আর বৃদ্ধিসাধন করে। আমাদের শরীরের সেলগুলিতে যে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ আছে তা প্রোটিন দিয়েই তৈরি। প্রোটিনই সেলের পুষ্টি লাগায়। কার্বোহাইড্রেট শরীরে তাপ যোগায়—কয়লার মতো। কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তি তৈরি হয় তারই জোরে এঞ্জিন চলে। তেমনি, কার্বোহাইড্রেট পুড়িয়ে যে শক্তি তৈরি হয় তাই দিয়ে আমাদের শরীরের এঞ্জিন চলে।

প্রোটিনই বলো, কার্বোহাইড্রেটই বলো, সবকিছুই কতক-গুলি মৌলিক পদার্থের মিশেল থেকে তৈরি। যেমন, কার্বন,

হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলিয়ে তৈরি হয় কার্বোহাইড্রেট। আরো অনেক জটিল মিশেল থেকে তৈরি হয় প্রোটিন, তার মধ্যে প্রধান জিনিস হলো নাইট্রোজেন।

এখন, এ সবই তো প্রকৃতির ভাণ্ডারে, পৃথিবীর বুকে মজুত আছে—কিন্তু আছে তাদের মৌলিক রূপে, কাঁচা অবস্থায়। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় তুলে এনে খেলে শরীরের পোষ্টাই হয় না। সেগুলোকে ভেঙে-ভেঙে অদল-বদল করে নিলে তবেই তা মানুষের শরীরে এসে কাজে লাগে।

সেই ভেঙে ভেঙে অদলবদল করে নেওয়ার কাজটা প্রাণী পারে না। ওই দুর্লভ শক্তিটা আছে শুধু উদ্ভিদের।

উদ্ভিদের বাহাদুরি এই যে, সূর্যের আলোকে সে ব্যর্থ হতে দেয় নি, তাকে কাজে লাগিয়েছে। যে মুহূর্তে সূর্যের সোনার আলো গাছের সবুজ পাতাকে স্পর্শ করছে, সেই মুহূর্তেই প্রাণহীন পদার্থসমষ্টি ভেঙে-ভেঙে তৈরি হচ্ছে জীবজগতের পদার্থ। তৈরি হচ্ছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি। সূর্যের আলোর সাহায্যে এই-যে অপূর্ব সৃষ্টি—এর নাম ফোটো-সিনথেসিস। বাঙলায় মানে করলে দাঁড়ায়—আলোর সাহায্যে সৃষ্টি।

প্রাণী কেন পারে না, উদ্ভিদ কেন পারে? উদ্ভিদের আছে ক্লোরোফিল-ওয়ালা সেল, প্রাণীর নেই।

উদ্ভিদের যজ্ঞিবাড়ির ভিয়েনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটাকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক।

উদ্ভিদের রান্নায় যোগান দরকার কিন্তু খুব সাধারণ ছুটি জিনিসের : জল আর বাতাস।

উদ্ভিদ জল পায় কী করে? মাটির নিচে আছে জল। সেই জলে গোলা আছে : নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, আর লোহা, গন্ধক, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি।

উদ্ভিদ মাটির নিচে শেকড় চালিয়ে চালিয়ে সেই নানান-জিনিসে-মেশা জল তুলে নিয়ে আসে, আর গুঁড়ির অসংখ্য শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে ওপরের ভিয়েনে তুলে দিয়ে আসে।

উদ্ভিদ বাতাস নেয় কী করে? তার পাতার তলার দিকটায় খুব ছোটো-ছোটো ফুটো আছে—যেমন আছে আমাদের গায়ের

চামড়ার ওপর। সেই ফুটোর ভেতর দিয়ে বাতাস চলাফেরা করে। বাতাসে আছে প্রধানত নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন, আর কার্বন-ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি। নাইট্রোজেনের সঙ্গে উদ্ভিদের একেবারে আড়ি: ফুটো দিয়ে যেমনি ঢোকে তেমনি বেরিয়ে যায়। শুধু কার্বনটুকুকেই তার দরকার, সেইটুকুই সে প্রায় চেঁছে-পুছে নিয়ে নেয়।

মালমশলা তো সব জোগাড় হলো। এখন চাই উনুন ধরাবার আগুন। আগুন আছে সূর্যের আলোয় কিন্তু তাকে ধরানো যাবে কী করে? ক্লোরোফিল বললো, আমিই আনছি সূর্যের আলোকে পাকড়াও করে, তাই দিয়ে উনুন ধরিয়ে দেবো। ক্লোরোফিল সূর্যের তেজকে ধরে উনুন ধরালো। হাঁড়ি চাপলো। আগুনে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ভেঙে ভেঙে তৈরি হলো: প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি ইত্যাদি। রান্না নামলো। সেই রান্না খাবার তরল হয়ে উদ্ভিদের সারা শরীরে ছড়িয়ে গেলো শিরা-উপশিরা বেয়ে—উদ্ভিদের নিজের শরীর রক্ষা পেলো। আর সেই অপূর্ব রান্নাই সুন্দর সুন্দর ফুলে সুস্বাদু ফলে বীজে শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে রইলো—অন্য প্রাণী সেই ফুল, ফল, বীজ খেয়ে জীবনরক্ষা করতে পারলো।

উদ্ভিদ-জগৎ না থাকলে প্রাণি-জগৎ উপোস করে মরতো।

আর দম আটকে মরতো।

সে কেমন কথা? উদ্ভিদ না থাকলে দম আটকে মরবে

কেন ?

বুঝে দেখো :

বাতাসে অক্সিজেন না থাকলে কোনো প্রাণী বাঁচে না। বাতাস থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে সে অক্সিজেন নেয় আর প্রশ্বাসের সঙ্গে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বার করে দেয়। কার্বন-ডাইঅক্সাইড প্রাণীর শরীরের পক্ষে বড়ো ক্ষতিকর। জানো তো, আজকাল আইন হয়েছে সিনেমায় বিড়ি-সিগারেট খেলে জরিমানা দিতে হবে। কেন এমন আইন হলো বলতে পারো ? মানুষ—সমস্ত প্রাণী—প্রশ্বাসের সঙ্গে বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বার করে দিচ্ছে। আবার, যেখানেই আগুন জ্বলে সেখানেই অক্সিজেন পুড়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। তাই বন্ধ ঘরে আগুন জ্বললে দুই কার্বন-ডাইঅক্সাইড মিলে বাতাসে ঐ দূষিত গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায়, অক্সিজেনের ভাগ যায় কমে। তাই নিশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে ওঠে, দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই এই আইন : বন্ধ ঘরে ধূমপান নিষেধ।

এমন যে মহামূল্য অক্সিজেন—বাতাসে তার পরিমাণ কিন্তু খুব কম—পাঁচ ভাগের প্রায় এক ভাগ। তাই যদি হয়, তাহলে তো ক্রমাগত খরচ হতে-হতে অক্সিজেনের ভাণ্ডার এই লক্ষ লক্ষ বছরে ফুরিয়ে যাবার কথা : উদ্ভিদ-জগৎ, প্রাণিজগৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কথা। তা হলো না কেন ?

সেও উদ্ভিদের কল্যাণে। সূর্যের আলোয় উদ্ভিদের পাতায়

যখন ফোটো-সিনথেসিস চলে, তখন বাতাসের সঙ্গে সে যতটুকু অক্সিজেন নেয় ততোটুকু তার কাজে লাগে না—বেশির ভাগটাই সে তার প্রশ্বাসের সঙ্গে বার করে দেয়।

তাহলে, সমস্ত প্রাণী দিনরাত বাতাসে ছাড়ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। আর উদ্ভিদ সারা দিনমান বাতাসে ছাড়ছে অক্সিজেন। তাই বাতাসে অক্সিজেনের ঘাটতি হচ্ছে না, প্রাণীদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

দেখো উদ্ভিদ আমাদের কতো দিক দিয়ে সাহায্য করছে। তার জন্যেই আমাদের জীবনধারণ, উদরপূরণ।

প্রাণিজগৎ যেমন এক সেল থেকে বহু সেল, সরল থেকে জটিল, অঙ্গহীনতা থেকে অঙ্গবহুলতার পথে এগিয়ে গেছে, উদ্ভিদজগৎও তেমনি বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে। সব-নিচের ধাপের উদ্ভিদরা হলো এক-কোষের জীব। তার-পর এলো ছাতা-জাতীয় উদ্ভিদরা—শেকড় নেই, গুঁড়ি নেই, পাতাও নেই। তবে এদের শরীরের গঠন অনেক সময়েই জটিল। শ্যাওলারাও সেই রকম। তাদের মূলে আছে এক-সেলওয়ালারা, তারপরে সেলের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এই ধাপে বহু-সেলওয়ালা উদ্ভিদও দেখা যায়। তার পরের ধাপে যারা তাদেরও শেকড় নেই—মাটির ওপরে কয়েকটি পাতায় একটু সবুজের আমেজ ছড়িয়ে দিয়েই তারা খালাস। তার ওপরের ধাপে যারা তাদের শেকড় আছে, গুঁড়ি আছে, পাতাও আছে, কিন্তু বীজ বলতে কিছু নেই : তার বদলে আছে রেণু।

তার ওপরের ধাপে যারা তাদের বীজ আছে। বীজওয়ালা উদ্ভিদদের দুটো দল : এক দলের বীজ ঢাকা। অপর দলের বীজ আঢাকা। ঢাকাবীজওয়ালাদের আবার দুটি দল : একদলের বীজে দুটি পাতা, যেমন কুমড়োবীজ। অপর দলের বীজ গোটাটাই একটা আস্ত জিনিস, যেমন ভুট্টাবীজ।

সব-উঁচু ধাপের উদ্ভিদ যারা, তাদের দেহে চারটি প্রধান অঙ্গ :

এক, গুঁড়ি। সেইটাই গাছের মূল কাঠামো। কাঠ দিয়ে তৈরি। কাঠ মানে সরু, লম্বা, শক্ত আবরণে ঢাকা সেলের সমষ্টি।
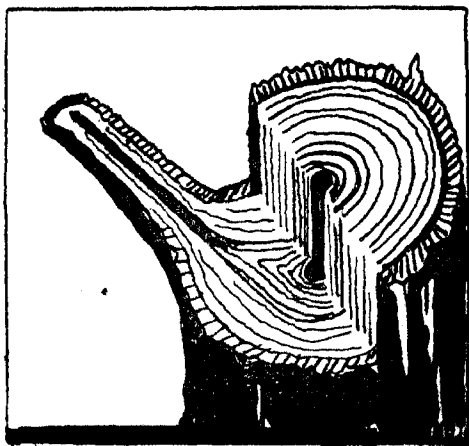
গাছের গুঁড়ি কাটলে ভেতরে এই রকম গোল-গোল দাগ দেখতে পাবে। এর থেকেই গাছটার বয়েস হিসেব করে ফেলা যায়। হিসেবটা সহজ। যে কটা দাগ, গাছের বয়েস সেই ক-বছর। কেননা, প্রতি বছরই গুঁড়ির মধ্যে এই রকম এক-একটা দাগ পড়ছে।

দুই, পাতা। সূর্যের আলো ধরবার কল। পাতার গড়ন এমন আর ডালে এমন কায়দা করে তারা সাজানো থাকে যে প্রত্যেক পাতাই যথাসম্ভব আলো পেতে পারে।

তিন, শেকড়। গোটা কাঠামোটাকে শক্ত করে মাটির সঙ্গে গেঁথে রাখে। এবং মাটি থেকে জল আর নানান রকম জলে-গোলা ধাতব খাদ্য শুষে নিয়ে ওপরে পাঠিয়ে দেয়।

চার, ফুল আর ফল।

গাছের বংশরক্ষার অঙ্গ হলো ফুল। ফুলের যেটা সরু লম্বা ডাঁটি, বা গর্ভকেশর, তার মাথায় আছে একটা থোবা, ভিজে চটচটে তার গা। একটু নিচে দেখা যায় সুতোর মতো জিনিস, তার গোল মাথাগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হলদে জিনিসে ভরতি। সেগুলোকে বলে ফুলের রেণু। আর ঐ ডাঁটির নিচে আছে কমণ্ডলুর মতো দেখতে এক গোল জিনিস, ফুলের গর্ভকোষ। তার মধ্যে আছে ফুলের ডিম।

বাতাসে উড়ে এসেই হোক বা মৌমাছির বা প্রজাপতির ডানায় আর পায়ের রোঁয়ায় লেগেই হোক ফুলের রেণু তার গর্ভমুণ্ডে এসে লাগে, তার ভিজে চটচটে গায়ে আটকে যায়। তারপর রেণুগুলি বাড়তে বাড়তে একেকটি ছোট্ট ফাঁপা নলের আকার পায়। সেই নলগুলি ডাঁটির ভেতর দিকের গা বেয়ে ফুলের গর্ভকোষের ডিমগুলির সঙ্গে মিলিত হয়। এরপর প্রতিটি ডিম বদলাতে শুরু করে, আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে ওঠে, বীজের আকার নেয়। তারপর সেই বীজের চারপাশে রসালো শাঁস গজায়। গোটা গর্ভকোষটাই ফলে

পরিণত হয়।

এইভাবেই ফুলের সাহায্যে উদ্ভিদ তার বংশরক্ষা করে চলে।

কিন্তু উদ্ভিদ তো স্থাণু, চলাফেরা করতে পারে না। তাহলে এ-ফুলের রেণু ও-ফুলের গর্ভমুণ্ডে গিয়ে পৌঁছয় কী করে! নিজে অচল বলে ফুলকে সাহায্য নিতে হয় অন্য সচল প্রাণীর, —মৌমাছির, প্রজাপতির। ফুলের এতো যে বাহার, পাপড়ির এতো যে বৈচিত্র্য, এতো যে মনমাতানো সুগন্ধ, এতো যে মিষ্টি

মধু—সে সবই হলো প্রজাপতি-মৌমাছিকে মধুর লোভ দেখিয়ে, গন্ধেরঙে মুগ্ধ করে কাছে টেনে নেওয়ার জন্যে।

বীজের জন্মের কথা শিখেছি। এক-একটি বীজ হলো এক-একটি ছোট্ট ঘুমন্ত গাছ। ফলের খোলস থেকে বেরিয়ে সরস মাটিতে আশ্রয় পেলেই আস্তে আস্তে তার ঘুম ভাঙবে। উঁচু-ধাপের প্রাণীরা তাদের সন্তানদের যত্ন করে স্নেহ দিয়ে বড়ো করে তোলে। কিন্তু উদ্ভিদ তা পারে না। মনে করো, একটা গাছের যতো বীজ সবগুলোই যদি তাদের মা-গাছেরই নিচের মাটিতে নেমে যায়—সেই মাটিতেই আশ্রয় নিয়ে তারা বড়ো হয়ে উঠতে চায়—তাহলে কী হবে? ভিড়ের চোটে একটি চারাও বাঁচবে না। মানুষের সন্তান বড়ো হয় তার মায়ের কাছেপিঠে থেকে। উদ্ভিদের সন্তান বড়ো হতে পারে তার মায়ের কাছ থেকে দূরে গিয়ে। তাই শালগাছের বীজ ডানা মেলে আকাশে উড়ে যায়, কাশ-শিমুলের বীজও বাতাসে ভেসে দূরের মাটিতে আশ্রয় খোঁজে। কতক বীজ আছে যারা জলে ভেসে চলে—যেমন নারকেলের বীজ। জলে যাতে পচে না যায় তাই তারা হালকা খোলস দিয়ে মোড়া।

ফলাহার

জঁ ব্যাপতিস্ত, চারদিন-এর তুলিতে আঁকা
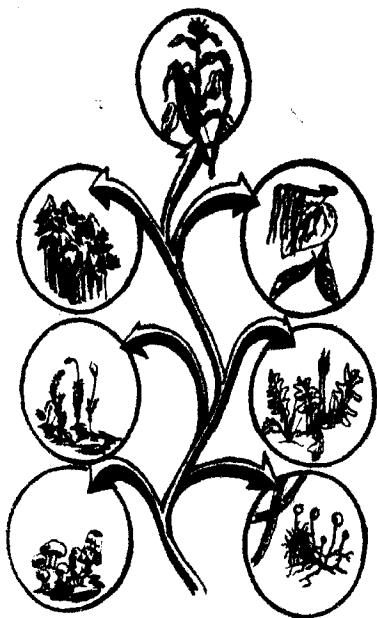
পৃথিবীতে যতো রকম গাছগাছড়া আছে সেগুলোকে মোটের ওপর এই সাত ভাগে ভাগ করা যায়।

ফুলের বাহার

ফুলের বাহার

রকমারি ফার্ন
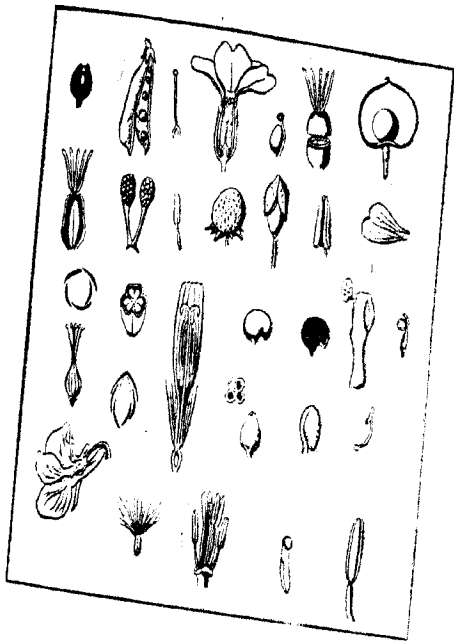
ফুলের ওপর অপারেশন্—কেটে কেটে ফুলের বিভিন্ন অঙ্গ দেখানো হয়েছে

কয়েক রকম ফুল

কয়েক রকম ফল
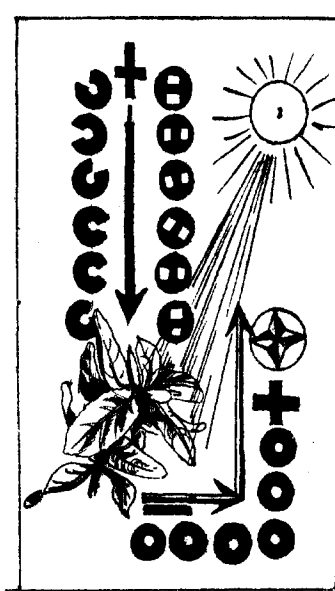
ফোটোসিন্‌থেসিস্‌ : সবুজ পাতায় এসে জমলো কার্বন-ডাইঅক্‌সাইডের ছটি অণু আর জলের ছটি অণু। পাতায় ছিলো ক্লোরোফিল্‌। আর এমনই মজা যে সূর্যের আলো পেয়ে পাতার ক্লোরোফিল-ওয়ালা সেলগুলো কার্বন-ডাইঅক্‌সাইড আর জলের অণু থেকে বানিয়ে ফেললো গ্লুকোস্‌ নামের খাটি চিনির একটি অণু আর ছটি অক্সিজেনের অণু।

আচ্ছা, এমন চারটে জন্তুর নাম করতে পারো যার প্রথম অক্ষর 'ক'?

কেঁচো কচ্ছপ কোকিল কুমির

আচ্ছা, এমন চারটে জন্তু যার প্রথম অক্ষর 'ব'?

বাঘ বিছে বোলতা বক

কিন্তু তোমাকে যদি বলি, বাঙলায় যতো অক্ষর আছে তার প্রত্যেকটি দিয়ে তুমি যতো জীবের নাম জানো লিখে-লিখে যাও, তুমি কতোগুলো নাম লিখতে পারবে?

এক শো? দুশো?

তোমার যে দাদা কলেজে পড়েন তিনি হয়তো আরো দু-তিন শো নতুন নাম জানেন।

কিন্তু দাদারও দাদা আছেন—তাঁরা প্রাণিবিদ্যার বড়ো বড়ো

পণ্ডিত। তাঁদের মুখে শুনে তুমি অবাক হয়ে যাবে যে,

মানুষ এ-পর্যন্ত পৃথিবীতে আট লক্ষ রকমের প্রাণীকে চিনতে পেরেছে।

আট লক্ষ! বুঝতে পারছি, এক্ষুনি তুমি হাত গুটিয়ে বলবে, দরকার নেই বাবা জীবজন্তুর কথা শিখে! আট লক্ষ জন্তুর জীবনী বসে-বসে শুনবে কে?

কথাটা সত্যি। বসে-বসে আট লক্ষ রকমের প্রাণীর জীবনী শুনতে না চাইলে কেউ তোমার নিন্দে করবে না।

তোমার ভয়টা কিন্তু সত্যি নয়।

কেননা, জীবজন্তুর কথা শেখবার জন্যে সত্যিই তোমাকে ওই আট লক্ষ প্রাণীর জীবনী আলাদা-আলাদা করে শুনতে হবে না। যাঁরা জীবজন্তুর কথা জানতেই ব্যস্ত তাঁরা এ-বিষয়ে একটা সহজ উপায় বের করেছেন। সোজা কথায় উপায়টা হলো গোছগাছ করে নেওয়া। যেমন ধরো, তোমার সামনে একরাশ পাঁচমিশেলি বই ধরে দিলাম। তুমি করলে কি, বেছে-বেছে আলাদা-আলাদা ধরনের বইগুলোকে আলাদা-আলাদা ভাগে ভাগ করে নিলে : গল্পের বই, পদ্যের বই, অঙ্কের বই, ব্যাকরণের বই। বৈজ্ঞানিকেরাও খানিকটা এইভাবেই আট লক্ষ রকমের প্রাণীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেন : মিল খুঁজে খুঁজে এক-এক রকম প্রাণীকে এক-এক ঘরে ফেলেন। এইভাবে ভাগ করে নেবার বৈজ্ঞানিক নাম হলো শ্রেণী-বিভাগ—প্রাণীগুলোকে নানান শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলা। তাহলে আর ঐ আট লক্ষ প্রাণীকে আলাদা-আলাদা করে

জানবার দরকার পড়ে না। যে কটা শ্রেণীতে প্রাণীগুলোকে ভাগ করা হলো সেই কটা শ্রেণীর কথা জানলেই মোটের ওপর সমস্ত প্রাণীকে জানা হয়ে যায়।

পৃথিবীতে যতো প্রাণী আছে বৈজ্ঞানিকেরা তাদের দশটি প্রধান পর্বে ভাগ করেছেন। কী নিয়মে ভাগ করা হয়েছে? শরীরের মিল দেখে-দেখে। যেমন ধরো, কোনো কোনো প্রাণীর শিরদাঁড়া আছে, কোনো কোনো প্রাণীর শিরদাঁড়া নেই। যাদের শিরদাঁড়া আছে, তাদের ফেলা হলো এক পর্বে। আবার গুগলি-শামুক, যারা খোলার মধ্যে থাকে, তাদের নিয়ে আর-এক পর্ব। সাপ-গিরগিটিদের মতো যারা বুকে হেঁটে চলে তারা পড়লো আর-এক পর্বে। এইভাবে দশটি পর্ব। অবশ্য, পণ্ডিতদের সূক্ষ্ম হিসেবে পর্ব ১৪টি। কিন্তু এই বই পড়ে তো আমরা পণ্ডিত হতে যাচ্ছি না। মোটামুটি জ্ঞান পেতে হলে এখন দশটি পর্বের কথা জানলেই চলবে।

তাহলে শুরু হোক—

॥ প্রথম পর্ব ॥

প্রথম পর্বের নাম প্রোটোজোয়া। সেলের কথা শিখেছো। সবচেয়ে নিচের ধাপের প্রাণীর দেহ একটিমাত্র সেল দিয়ে তৈরি। ঐ একটিমাত্র সেল দিয়েই তারা জীবনযাপনের যাবতীয় কাজ করে—খাওয়া, হজম করা, নিশ্বাস নেওয়া, নিশ্বাস ফেলা, বংশবৃদ্ধি করা—সব। এই ধরনের সব-নিচের ধাপে যে-শ্রেণীর প্রাণী তার নাম দেওয়া হয় প্রোটোজোয়া।

প্রোটোজোয়া অবশ্য একরকমের নয়, নানা রকমের। আমাদের ওই অ্যামিবা একটা প্রোটোজোয়া। কিন্তু এইখানে একটি কথা মনে রেখো। সব প্রোটোজোয়ার শরীরই যে শুধুমাত্র একটি সেল দিয়ে তৈরি, তা নয়। কোনো কোনো প্রোটোজোয়ার শরীরে একটার বেশি সেল রয়েছে, কিন্তু সেলগুলোর মধ্যে সম্পর্কটা ঢিলেঢালা, যেন আলগোছে একসঙ্গে জটলা পাকিয়েছে।

প্রোটোজোয়ারা খুব ছোট্ট—এত ছোট্ট যে মাইক্রোসকোপ [অণুবীক্ষণ] দিয়ে দেখতে হয়।

প্রোটোজোয়া দেখবে ? তাহলে, কাছাকাছি কোনো পানা-পুকুর থেকে একঘটি জল তুলে নিয়ে [illegible]া। ঘটির জল-টাকে কয়েকটা বোতলে ঢেলে দাও। ঐ[illegible]বেই থাকুক বোতল-গুলো জলভরতি। দশ-বারো দিন পরে ড্রপারে করে একফোঁটা জল তুলে এনে পাতলা কাঁচে মাখি[illegible] মাইক্রোস-কোপের নিচে যদি রাখো, কী দেখবে ? মাইক্রো[illegible]কোপে চোখ দিয়ে প্রোটোজোয়ারদের ছবিগুলো ভালো করে দেখো, কী রকম কিম্ভূতকিমাকার চেহারার প্রাণী দেখতে পাবে। কিন্তু পুকুরের জল কয়েক দিন ধরে বোতলে ভরে রাখতে হলো কেন ? কেননা এই কদিন ধরে জলের মধ্যে প্রোটোজোয়ার বাচ্চা হয়েছে—বংশবৃদ্ধি হতে হতে তারা অনেক অসংখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই জন্যে তাদের দেখতে পাওয়া অতো সহজ হলো। তার মানে, পানাপুকুরের জলেই প্রোটোজোয়া ছিলো, বোতলের মধ্যে কদিন ধরে তারা দলে বেড়েছে। অবশ্য প্রোটোজোয়ারা তো আর গোরুছাগলের মতো বাচ্চা পাড়ে না।

একটা সেল দু ভাগ হয়ে দুটো সেল হয়, দুটো থেকে চারটে—
—সেল কীভাবে নিজের বংশ বাড়িয়ে চলে সে-কথা তো আগেই বলেছি।

পানাপুকুরের জল থেকে যে-প্রোটোজোয়াদের দল ধরে আনলে, তার মধ্যে বেশির ভাগই অ্যামিবা। প্রোটোজোয়া হলো পর্ব-নাম, অ্যামিবা জাতি-নাম। যেমন, ভুবনমোহন সাধু, খানিকটা যেন তেমনই অ্যামিবা প্রোটোজোয়া। ভুবনমোহন ছাড়াও সাধু আছে, অ্যামিবা ছাড়াও প্রোটোজোয়া আছে।
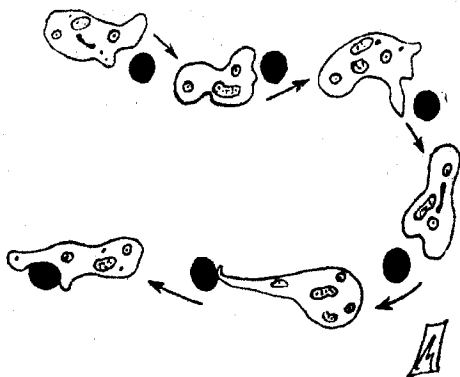
প্রোটোজোয়া কী করে খায়? বড়ো মজার ব্যাপার। ছবিতে দেখো, একটি প্রোটোজোয়ার শরীর থেকে কয়েকটা অংশ ঠেলে বেরিয়ে গেছে। এগুলোই হলো ওর ঝুটো পা। ঝুটো পা বলছি এই জন্যে যে ওর শরীরে পা বলে সত্যিই কোনো বাঁধাধরা অঙ্গ নেই—শরীরের যে-কোনো অংশ ওইভাবে ঠেলে বেরিয়ে পায়ের মতো হয়ে যায়। এখন ধরো, ওর সামনে এক

টুকরো খাবার রয়েছে। ও করবে কি, ঝুটোপাটাকে খাবারের দিকে ঠেলে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে তার গোটা শরীরটাই সেই দিকে এগিয়ে যাবে। যখন খাবারটায় শরীরে লাগালাগি হবে, তখন সে খাবারটাকে গিলে ফেলবে। কিন্তু আমাদের মতো মুখ তো আর তার নেই। তাই তার পক্ষে খাবার গেলা মানে পুরো শরীরটা দিয়ে গেলা—যেন সাপটে ধরা বা জাপটে ধরা।

আর-এক রকম প্রোটোজোয়ার কথা শোনো। কালোজাম, গোলাপজাম দেখেছো। লালজাম দেখতে চাও তো পাহাড়ে চলো। চতুর্দিক বরফে সাদা, হঠাৎ দেখলে একটা জায়গা লালে লাল হয়ে আছে, রক্তের মতো টকটকে লাল। এটা হলো ব্লাডবেরি নামে এক জাতের প্রোটোজোয়ার কীর্তি। কোটি কোটি ব্লাডবেরি ওখানে আলগোছে জটলা পাকিয়েছে। তাদের গায়ের রঙে বরফের রঙও লাল হয়ে গেছে। তাহলে দেখছো, ব্লাডবেরি বলে প্রোটোজোয়ারা অ্যামিবার মতো একা-একা থাকে না, ঝাঁক বেঁধে থাকে। কিন্তু তাদের পরস্পরের সম্বন্ধটা ঢিলেঢালা ধরনের, যেন আলগোছে আটকানো।

ব্লাডবেরি প্রোটোজোয়ার কথা শুনলে। 'রাতের আলো' প্রোটোজোয়ার কথা আরো মজাদার। ওরা ঝাঁকে-ঝাঁকে সমুদ্রের বুকে বাসা বাঁধে। গায়ে জোনাকির মতো ফুট-ফুট আলো জ্বলজ্বল করে। সমুদ্রের বুকে রাতের কালোয় সেই নারাঙ্গি রঙের আলোর আভা যখন ফুটে ওঠে, কী সুন্দর বাহারই খোলে!

॥ দ্বিতীয় পর্ব : পোরিফেরা ॥

পোর মানে গর্ত। যাদের গায়ে গর্ত আছে তারা পোরিফেরা। গর্তওয়ালা কোনো প্রাণীর নাম মনে আসছে?

যদি বলি স্পঞ্জ?

স্পঞ্জ আবার জীবন্ত প্রাণী নাকি?

ঠিক কথা। তোমার স্লেট মোছবার স্পঞ্জের টুকরোটার মধ্যে প্রাণ নেই। কিন্তু ওটা একটা জীবন্ত প্রাণীর যেন কঙ্কাল—একদিন ওর দেহে আরো কিছু-কিছু জিনিস ছিলো আর তখন ওটা ছিলো জীবন্ত প্রাণীই। জীবন্ত অবস্থায় স্পঞ্জের গায়ের রঙ সবুজ।

পোরিফেরাদের শরীরে একটার বেশি সেল। সেলগুলো যে খুব জোট বেঁধে মিলেমিশে থাকে তা নয়, তবে তাদের মধ্যে একটা সাদাসিধে ধরনের সহযোগিতা, শৃঙ্খলা আছে। ঝাঁক-বাঁধা প্রোটোজোয়াদের মতো ঢিলেঢালা সম্পর্ক নয়।

॥ তৃতীয় পর্ব : সিলেনটারাজ্ ॥

নামটা খটোমটো, কিন্তু মানেটা সোজা: ফাঁপা পেট। ফাঁপা-পেটদের শরীর দুটো সেলের পর্দা দিয়ে তৈরি। সেলের গঠন এদের বেলায় একটু জটিল হতে শুরু করেছে। সেলগুলো দল পাকাতে শিখেছে—এক-এক দল সেল এক-এক ধরনের কাজে হাত পাকাতে শিখেছে।

সমুদ্রের ধারে জেলিমাছ দেখেছো? নরম থলথলে শরীর। এরাও ফাঁপা-পেট শ্রেণীর জীব।

ভূগোলের বইতে পড়েছো প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবালদ্বীপের কথা। ফাঁপা-পেট প্রবাল কীটদের শরীরের কঙ্কাল দিয়ে প্রবাল দ্বীপ তৈরি।

॥ চতুর্থ পর্ব : একাইনোডার্ম ॥

এই নামটাও খটোমটো। আমার নাম দিতে ইচ্ছে হয় : চক্রী; কারণ এদের শরীরটা দেখতে চাকার মতো। তারার মতোও বলতে পারো। মাঝখানে শরীরের আসল অংশ—গোলাকার। তার চার পাশ দিয়ে লম্বা-লম্বা অংশ বেরিয়ে গেছে—বাই-সাইকলের স্পাইকের মতো। তারামাছ এই শ্রেণীর প্রাণী।

এরাও বহু-সেল প্রাণী। পেশী, স্নায়ু, লিভার, পাকস্থলী,—আস্তে আস্তে এ-সবই এদের শরীরে দেখা দিয়েছে।

তারামাছেরা এক রকমের ঝিনুক ধরে খায়। ঝিনুক ওদের চেয়ে অনেক বড়ো; তবু তাদের কী করে কাবু করে শোনো।

ঝিনুক সামনে এলেই তারামাছেরা করে কি, ঝিনুকটাকে হাতগুলো দিয়ে ঠেসে সাপটে ধরে। আর তার খোলোসের জোড়ের মুখে পা ঢুকিয়ে টান মারতে থাকে। কিন্তু ঝিনুকের গায়ে অনেক বেশি জোর, তার গায়ের ওপর শক্ত খোলা। সে শরীরটাকে টান-টান করে রাখে। প্রথম-প্রথম তার কিছুই হয় না। মিনিট কুড়ি এইভাবে কেটে যায়। অতোক্ষণ একভাবে শরীরটাকে টান করে রাখার ফলে এবার ঝিনুক অবশ হয়ে পড়ে, খোলাটা খুলে আসে, খোলার ভেতরকার নরম-নরম শরীর বেরিয়ে আসে। তারামাছ কিন্তু তখনও ঝিনুককে গিলতে

পারে না—ঝিনুক যে অনেক বড়ো। তখন সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে—তার পাকস্থলীটাকে মুখ দিয়ে উল্টোভাবে বার করে এনে তাই দিয়ে ঝিনুকটার নরম শরীরটাকে ঢেকে দেয়। তারপর আস্তে আস্তে গেলে আর হজম করে।

তারামাছের চলাও বড়ো অদ্ভুত। ঐ যে এক-একটা হাত, হাতের নিচে আছে সার-সার ছোটো-ছোটো টিউব—তারা রবারের মতো চাপ পেলে বড়ো হয়। টিউবের বাইরের মুখ বন্ধ। ভেতরের খোলা মুখটা শরীরের ভেতরে। শরীরের মধ্যে একটা থলি আছে, সব সময়ে জলে ভরতি থাকে। যখন চলতে হবে, তখন তারামাছ থলির জল টিউবগুলোর মধ্যে চালিয়ে দেয়। চাপ পেয়ে টিউবগুলো বেড়ে যায়। তখন তার টিউব-পা দিয়ে জল ঠেলে-ঠেলে সে এগিয়ে যায়।

এর পরের তিন পর্বে পড়ে কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়। পোকারা তিন রকম চেহারার হয় :

৫ম পর্বে—ফিতের মতো চ্যাপ্টা পোকা। এরা পরজীবী—অন্য প্রাণীর শরীরে গিয়ে বাসা বাঁধে, সেই প্রাণীর খাবারে ভাগ বসিয়ে মহানন্দে বেঁচেবর্তে থাকে, তারই শরীরে ডিম পাড়ে।

৬ষ্ঠ পর্বে—সাধারণ গোল পোকা।

৭ম পর্বে—গোল, কিন্তু আস্তাগুা গোল নয়—যেন আঙটির মতো অনেকগুলি গোল মালার মতো জুড়ে এদের গোটা শরীরটা তৈরি। কেঁচো, জোঁক এই পর্বে পড়ে। কেঁচো তা বলে পরজীবী নয়, বরং মানুষের অনেক উপকার করে। জোঁক কিন্তু পরজীবী—মানুষের রক্ত চুষে খায়।

পোরিফেরা শ্রেণীর প্রাণীদের খুব রঙের বাহার।

এখন যাদের কথা শুনবে তারাও খুব রঙদার প্রাণী। সমুদ্রতীরে গেলে তাদের দেখা পাবে। তবে তখন তারা জ্যান্ত নেই—শুধু শরীরের খোলোসটা ঢেউয়ে ভেসে উঠেছে ওপরে। সেই খোলোসই হলো, শাঁখ, কড়ি, ঝিনুক,—মানুষ কতো যত্ন করে সেগুলি সংগ্রহ করে রাখে।

এরা ঝাড়েবংশে কম নয়—প্রায় ৮০ হাজার ঘর। বেশির ভাগই থাকে জলে—সমুদ্রে বা হ্রদে বা পুকুরে।

অনেকের ধারণা, এরা বোধহয় খোলোসটাকে বাড়ির মতো ব্যবহার করে। আমরা যেমন সারা দিন বাইরে কাজকর্ম করে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরি, এরাও বোধহয় তেমনি বাইরে বাইরে ঘোরাফেরা করে আবার খোলোসে এসে ঢোকে।

এই ধারণাটা ঠিক নয়। ওদের খোলোসটা শরীরের সঙ্গে গাঁথা একটা অঙ্গ, সারা জীবন ওরা তারই মধ্যে থাকে। চলবার সময় খোলোস থেকে পাটা আর মাথাটা বার করে নেয়।

এঁর সঙ্গে আমাদের খুব চেনাজানা আছে। কিন্তু এঁকে কোন দলে ফেলবে বলো তো?

॥ নবম পর্ব : আরথ্রোপডস ॥

আরথ্রো মানে জোড়া, পড মানে পা। যাদের জোড়া পা, সেই পতঙ্গেরা এই শ্রেণীতে পড়ে।

এরা আমাদের প্রতিদিনের চেনাজানা জীব : পিঁপড়ে, বোলতা, আরসোলা, ফড়িং, প্রজাপতি। চেহারা কারো সুন্দর কারো কুৎসিত; কারো শরীর কঠিন কারো কোমল; কেউ কামড় দেয় কেউ হুল ফোটায়; কেউ ওড়ে কেউ হাটে; কেউ ওড়ে দিনে কেউ রাতে।

আর কতো দেরি? আরো কতো দূর?

রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।

প্রোটোজোয়া, পোরিফেরা, সিলেনটারাজ, একাইনোডার্মস, কীটপতঙ্গ, মোলাস্কদের রাজ্য পেরিয়ে আমরাও আমাদের বাড়ির কাছে এসে পৌছেছি। কিন্তু 'দুই বিঘা জমি'র উপেন 'হাটে মাঠে বাটে' মাত্র 'বছর পনেরো ষোলো' কাটিয়ে বাড়ির কাছে এসে পৌছেছিলো, আর আমাদের মানুষের রাজ্যে পৌছতে ৫০ কোটি বছরের রাস্তা পেরোতে হলো।

৫০ কোটি বছর আগেকার পৃথিবী থেকে আমাদের

'যাত্রা হলো শুরু'। চারিদিকে কী দেখছি? 'ধূ ধূ করে যেদিক পানে চাই, কোনোখানে জনমানব নাই'। পাখি নেই, জন্তু নেই। গাছপালা কী বলো, একটা ঘাসও নেই। শুধু পাহাড় পাহাড় পাহাড়। সূর্য ওঠে, সকাল হয়, কিন্তু জীবনের কল-কোলাহল জাগে না। সন্ধ্যা নামে, কিন্তু ঘুম নামবে এমন ক্লান্তি-ভরা চোখ কোথাও নেই। প্রাণহীন। সব প্রাণহীন।

কিন্তু জলে? জলে জীবনের স্পন্দন দবদব করছে। কতো গাছ, কতো মাছ, আরো কতো খুদে-খুদে প্রাণী কতো [illegible]দের রঙের বাহার।

এই অসংখ্য বিচিত্র জলজীবদের মধ্যে একটিকে ভালো করে চিনে রাখো: একাইনোডার্ম। ওদের চলাফেরার কায়দাটাও ভালো করে নজর করা দরকার। সমুদ্রজীবদের মধ্যে তখনও পর্যন্ত ওরাই সবচেয়ে উন্নত।

উদ্ভিদ স্থির, প্রাণী চলাফেরা করে! চলাফেরা না করলে বাঁচবে কী করে? খাবার তো আর আয় বললেই মুখের ভেতর এসে পড়বে না!

চলতে পারা চাইই। কিন্তু সব প্রাণী কি একই রকম চলতে পারে? কেউ কেউ ভালো করে পারে, তাড়াতাড়ি পারে। যারা তাড়াতাড়ি চলতে পারে তাদের অনেক জিত: খাবার দেখলেই চট করে সেদিকে ছুটে যেতে পারে, অন্য কেউ হামড়ে পড়ার আগেই খাবার নিয়ে চম্পট দিতে পারে।

তাহলে, যার চলার যন্তর যতো ভালো তার টিকে থাকার জোর ততো বেশি। কিন্তু শুধু ছুটতে পারলেই হলো না।

কোথায় ছুটবো, কোনদিকে পালাবো—তাও বোঝা চাই। সেটা বুদ্ধি খাটানোর ব্যাপার। বুদ্ধি খাটায় কে? মাথার মগজ।

তাহলে যে ভালো চলতে পারে আর মগজ খাটিয়ে চলতে পারে, জিত হয়ে যাবে। নয় কি?

নিচের ধাপের জলপ্রাণীদের সকলের মগজ নেই।

একবার জলের মধ্যে ট্রাইলোবাইট বলে একজাতীয় জীব বড়ো অত্যাচার শুরু করে দিলো। গায়ে তার সাংঘাতিক জোর, যাকে পায় তাকেই খায়। নরম-নরম বোকাসোকা যে-মগুজে প্রাণীগুলো ঝাড়ে-বংশে নির্বংশ হয় আর কি!

একদল প্রাণীর কাছে কিন্তু ট্রাইলোবাইটের গায়ের জোরের গুমোর টিকলো না। কারণ, তাদের ছিলো মগজের গুমোর, মাথা খাটাবার বুদ্ধি। ট্রাইলোবাইট বাঁই-বাঁই করে ছুটে আসছে দেখলেই তারা ধাঁ করে সরে যায়।

মগজ আছে বলেই বোধহয় পণ্ডিতেরা এদের খুব একটা গমগমে আওয়াজের নাম দিয়েছেন: অসট্রাকোডার্ম। এরাই বোধহয় প্রথম মগজওয়ালা প্রাণী। কিন্তু জলের প্রাণী।

পণ্ডিত মশায় বলেন 'পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্'। নিজের ছেলের কাছে হারলে লজ্জা নেই।

মহামহোপাধ্যায় অসট্রাকোডার্মও শেষ পর্যন্ত হার মানলেন—নিজেরছেলে কি না জানি না, তবে নিজের বংশেরই ছেলে বটে। সেই বংশধরটি হলো

মাছ

অসট্রাকোডার্ম-এর ওপর মাছের জিত কী করে হলো?

মাছের মগজ আছে, জল কেটে তাড়াতাড়ি চলার জন্যে আছে দু-জোড়া পাখনা, সামনে-পেছনে-ছুঁচলো গড়নের শরীর।

আর-একটি জিনিস আছে: পিঠের ওপরে টুকরো-টুকরো হাড় একছড়া। টুকরো-হাড়ের এই ছড়াটি হলো শিরদাঁড়া, মেরুদণ্ড।

তাহলে, মাছেদের সময় থেকে প্রাণিজগতে দুটো নতুন ভাগ দাঁড়িয়ে গেলো। যাদের শিরদাঁড়া আছে আর যাদের শিরদাঁড়া নেই।

দুনিয়ার সমস্ত সমেরুক অর্থাৎ শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণীর তিনটি বিষয়ে মিল:

॥ ১ ॥ চলার জন্যে দু-জোড়া যন্তর: মাছের
দু-জোড়া পাখনা, পাখির একজোড়া পা + একজোড়া ডানা, অন্য
প্রাণীর দু-জোড়াই পা; মানুষের শরীরে সেটা হয়ে গেছে
একজোড়া হাত + একজোড়া পা।

॥ ২ ॥ মাথার খুলির মধ্যে ঢাকা মগজ, আর

॥ ৩ ॥ পিঠের ওপর শিরদাঁড়া

মাছ জলচর।

কথায় বলে, যতোক্ষণ শ্বাস, ততোক্ষণ আশ। ডাঙায় তুললে মাছ খাবি খায়, শ্বাস নিতে চায়। কিন্তু কেন? ডাঙার বাতাসেও তো অক্সিজেন আছে, তাই নিয়ে মাছ বাঁচে না? না। জলের থেকে অক্সিজেন নেওয়ার মতো করে তার শরীর তৈরি। হাতি-ঘোড়া-মানুষ ডাঙার বাতাস থেকে অক্সিজেন নেয়—ফুসফুস দিয়ে। মাছ জলের থেকে অক্সিজেন নেয়—

কী দিয়ে? মাছের ফুসফুস নেই, কানকো আছে। মাছ কানকো দিয়ে নিশ্বাস নেয়।

না। ভুল বললাম। মাছেরও ফুসফুস আছে।

একদিন ভীষণ বিপদে পড়েছিলো মাছেরা—জীবনমরণ সমস্যা।

পুরনো দিনের পৃথিবীতে মেঘ-রোদ্দুরের মেজাজ ছিলো বড়ো খামখেয়ালি। বৃষ্টি যদি একবার নামলো তো আর থামবার নাম নেই। বছরের পর বছর শুধুই বৃষ্টি। আর যখন শুরু হলো খরার দিন তখন খালবিল নদনদী সব শুকিয়ে ঠনঠন তবু আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। বছরের পর বছর এই অবস্থা।

এই রকমের এক দুর্যোগের যুগে মাছদের ডেকে প্রকৃতি যেন বললো, 'জল পাবে না, বাঁচতে চাও তো ডাঙায় ওঠো'। তখন ডাঙায় উঠে বাতাস থেকে নিশ্বাস নেবার চেষ্টায় মাছের শরীরে ফুসফুস গজালো। এখন পৃথিবীতে জলের কোনো অভাব নেই। তাই ফুসফুসেরও আর দরকার নেই। তবু সেটা থেকে গেছে মাছের শরীরে। মাছের পটকা সেই ফুসফুস।

খরার দিনে ফুসফুসের জোরে মাছ রক্ষা পেলো। আরেক দল জলের প্রাণী বাঁচলো পায়ের জোরে। সে কী পা! কী বা চলন! যাই হোক, তবু কাজ তো চললো। সেই পা টেনে টেনে তারা যেখানে খানাখন্দে একটু জল তখনও জমে আছে সেখানে উপস্থিত হলো। কিন্তু এরা জলের মায়া পুরোপুরি কাটাতে পারলো না। এরা হলো উভচর—প্রথম

জীবনে থাকে জলে, পরের জীবনে ডাঙায়। যেমন, ব্যাঙ। ব্যাঙাচি-জীবন কাটে জলে, ল্যাজ খসে ব্যাঙ হলে উঠে আসে ডাঙায়। কিন্তু জলে তাকে তবু নামতেই হয়—ডিম পাড়বার জন্যে। ব্যাঙের ডিম ডাঙায় বাঁচে না।

সরীসৃপ। পুরোপুরি ডাঙার জীব,—টিকটিকি, গিরগিটি, সাপ, কুমির—এদের জাতিনাম হলো সরীসৃপ।

অনেক হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বুকে চললো এদের অপ্রতিহত রাজত্ব। কেন, ভালো করে বুঝে নেওয়া যাক।

প্রথম কথা, মাছ-ব্যাঙের মতো ডিমপাড়া প্রাণী হলেও এরা ডাঙায় ডিম পাড়তে পারলো। আর সেই ডিমের ওপর একটা পুরু খোলোস থাকায় ডিমগুলোর বাঁচবার সম্ভাবনা বাড়লো।

দ্বিতীয়ত, এই জাতি সত্যিই হাঁটতে পারলো। ব্যাঙেদের মতো লেঙচে-লেঙচে হাঁটা নয়, শক্ত চারটে পায়ের ওপর শরীরের পুরো ভর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁটা। সত্যিকারের হাঁটা।

আর এই পায়ের তফাত হতে হতে এদের মধ্যে নানান ভাগ দাঁড়িয়ে গেলো। একদল সরীসৃপের পা লম্বা হয়ে যেতে লাগলো, একদল পা হারিয়ে সাপ হয়ে গেলো। একদল পাকে পাখনা বানিয়ে জলে নেমে সাঁতার কাটতে লাগলো। আবার এদেরই একটা দল পাকে ডানা বানিয়ে আকাশে উড়তে শিখলো। অবশ্য, তাই বলে যেন এমন কথা মনে
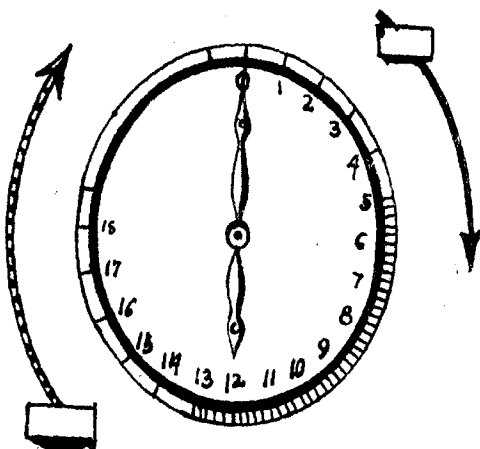
প্রকৃতির ঘড়ি। মানুষের ঘড়িতে ৬০ সেকেণ্ডে মিনিট, ৬০ মিনিটে ঘণ্টা। প্রকৃতির ঘড়িতে ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার বছরে এক মিনিট, ১০ কোটি বছরে এক ঘণ্টা। ঘড়ির কাঁটা যখন শূন্যের ঘরে, তখনই পৃথিবীতে প্রাণের জন্ম হলো। ঘড়িতে যখন ৮টা বেজে ১২ মিনিট, তখনই প্রথম শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণীর জন্ম হলো—তার আগে পর্যন্ত যতো প্রাণী কারুরই শিরদাঁড়া নেই। ঘড়িতে যখন ৯টা, জল থেকে হুপ করে ডাঙায় লাফ মারলেন উভচরেরা ব্যাঙেদের মতো। ৯টা ২৪ মিনিটে সরীসৃপেরা এলেন। সরীসৃপদের বড়োকর্তা ডাইনোসার এলেন ১০টা ১০ মিনিটে। ১০টা ১৫ মিনিটে এলেন স্তন্যপায়ীরা, ১০টা ৪০ মিনিটে পাখিরা।

মানুষ? মানুষ এসেছে এই মাত্র মিনিট দেড়েক আগে।

ঘড়ির ১২টা মানে বর্তমান যুগ।

প্রকৃতির ঘড়ির হিসেবকে মানুষের ঘড়ির হিসেবে দাঁড় করাও তো—দেখি অঙ্কে তোমার কেমন মাথা।

এঁরা কোন পর্বের জীব?
প্রোটোজোয়া

আর এঁরা?
পোরিফেরা

এঁরা
সিলেনটারাজ

ইনিও সিলেনটারাজ পর্বের প্রাণী, এঁর আরো চেনা নাম প্রবাল।
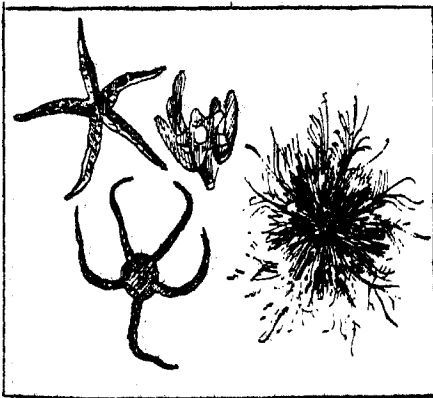
একাইনোডার্মস্ : কাঁটাওয়ালা শরীর

এঁদের মধ্যে তারা মাছকে চিনতে পারছো? আর তার পাশের ঐ কিম্ভুতকিমাকার জীবটির নাম জানো? সী আর্চিন।

(ওপরে) সী আর্চিন : শয়তানের গুরুঠাকুর। সমুদ্রে স্নান করতে নামলে গায়ে-পায়ে জড়িয়ে অস্থির করে তোলেন। (নিচে) তারামাছ : চলা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এঁর দাপট কম নয়।

নানারকম কীট : চ্যাপটা, গোল,

আঙটির-মতো গোল

মোলাস্ক, মানে নরম-নরম গা :

শামুক, গুগলি, কড়ি, ঝিনুক।
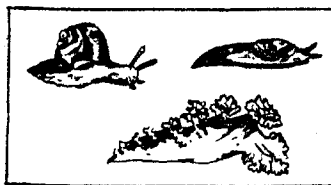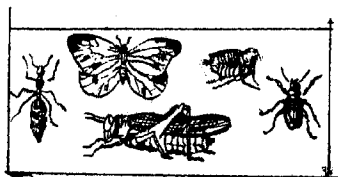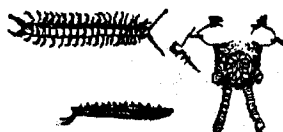
(ওপরে) 'ছয় পায় পিল-পিল চলি'—
পিঁপড়ে, আরশোলা, বোলতা, ফড়িঙ,
প্রজাপতির দল। নিচের যাঁরা তাঁদের
পা অবশ্য ছটার অনেক বেশি, কিন্তু এরা
একই 'জোড়া-পা' পর্বের প্রাণী।
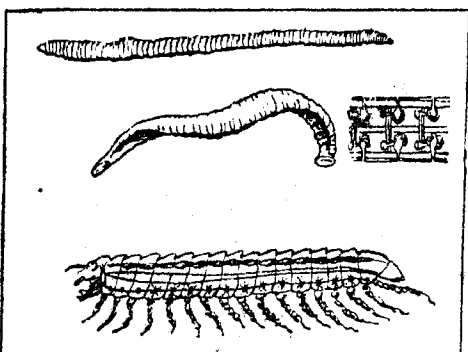
আরো কয়েকটা
জোড়া-পা প্রাণী
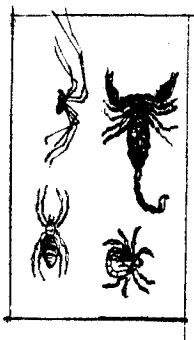
ওপরের ছবিতে
দেখো প্রজাপতির
জন্ম-ইতিহাস
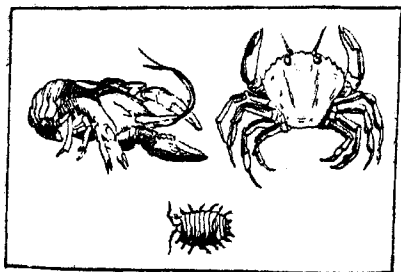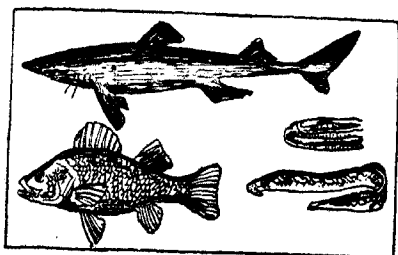
মাছ : এঁদেরই শরীরে প্রথম শিরদাঁড়া গজালো

এঁরা উভচর

এঁরা সরীসৃপ

নানারকম পাখি
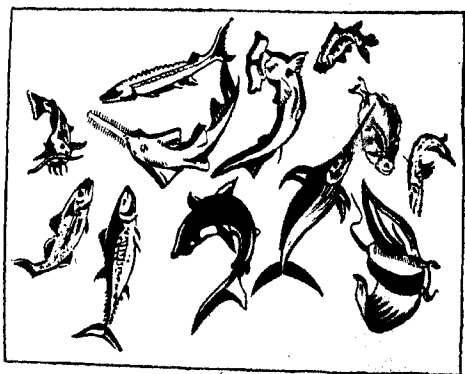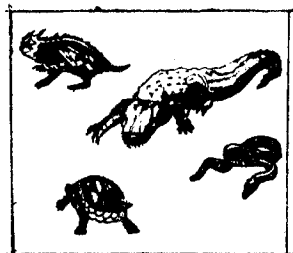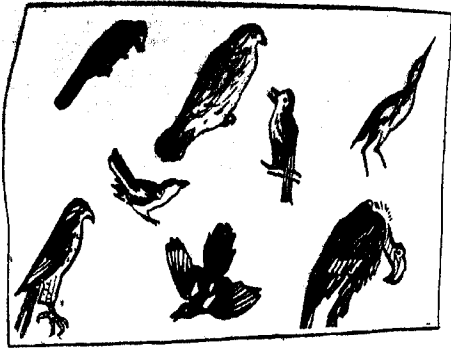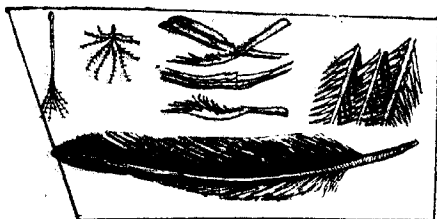
পাখির ডানা : (নিচে) পাখির রকমারি ঠোঁট
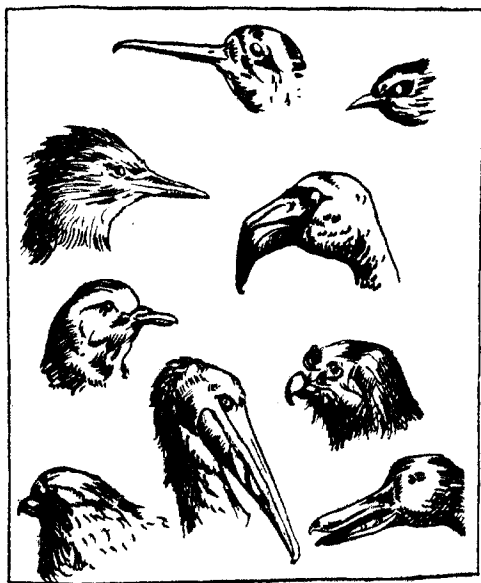
এঁরা সকলেই স্তন্যপায়ী। এঁদের কার কী নাম জানো? পর-পর দেখে যাও : বাদুড়, হরিণ, অস্ট্রেলিয়ার ডাকবিল আর ক্যাঙারু, বাঁদর। সব-ওপরে মাঝখানের ছবিটায় একটা স্তন্যপায়ীর ভেতরের নানান অংশ দেখানো হয়েছে
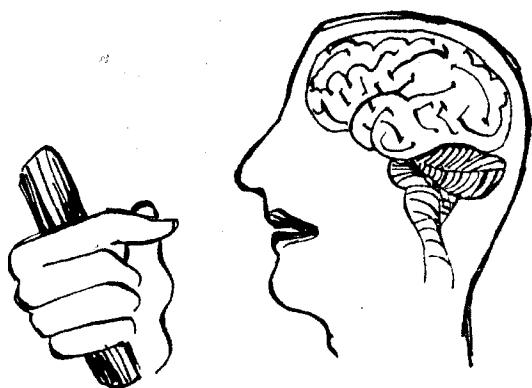
মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কি জানো? "হোমো স্যাপিয়েন্‌স্‌"। শব্দটা লাটিন, বাঙলা মানে হলো "জান্তা প্রাণী"—যে-প্রাণী জানে, যে-প্রাণী জ্ঞানী। সত্যি, মানুষের এ নামটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। মানুষ সকলের বড়ো এইজন্যে যে সে চিন্তা করে জানতে পারে, আর সেই জানাকে হাত দিয়ে প্রয়োগ করে জিনিসের ভোল পালটে দিতে পারে।

প্রাণিদেহে নানান অঙ্গ : মাথা, হাত, পা, মুখ, চোখ, ফুসফুস, পাকস্থলী ইত্যাদি। এক-এক দল সেল মিলে তৈরি করেছে এক-এক অঙ্গ। আবার কয়েকটি অঙ্গ মিলে এক-একটি তন্ত্র। এক-এক তন্ত্রের ওপর এক-এক কাজের ভার। যেমন, মুখ, অন্ননালি, পাকস্থলী লিভার—এইরকম কয়েকটি অঙ্গ নিয়ে পাচনতন্ত্র—তার ওপর হজম করার কাজ। তেমনি, নাক, ফুসফুস ইত্যাদি মিলে শ্বাসতন্ত্র—তার ওপর নিশ্বাস নেওয়ার কাজ। তেমনি এক-এক তন্ত্রের ওপর এক-এক কাজের ভার।

তাহলেই দেখছো, শরীরটা যেন একটা বিরাট কারখানা। এক-এক ঘরে এক-এক কাজ চলছে। সমস্ত কাজ তদারক করার জন্যে কারখানায় থাকে ম্যানেজার। শরীর-কারখানারও একজন ম্যানেজার আছে। তার নাম মগজ।

মানুষ সকলের বড়ো তার সবচেয়ে ভালো মগজের জোরে। মাথার শক্ত খুলির মধ্যে থাকে মগজ।

মগজ। একটা নরম জিনিস, চমৎকার কায়দায় ঢেউ খেলানো, মগজের সামনের দিকটা বড়ো, পেছনের দিকটা ছোটো।

মগজের দুটো কাজ। একটাকে বলে, প্রতিবর্তী ক্রিয়া। সেটা কেমন? হাতে ছ্যাঁকা লাগলো,-মগজের হুকুমে হাত সরিয়ে নিলাম, ধুলোর ঝড় আসছে, মগজের হুকুমে চোখ বন্ধ করলাম। এই ধরনের সাদাসিধে কাজগুলো হয় মগজের নিচের দিকটাতে।

মগজের আরেকটা কাজ আছে: বিচারের কাজ, বুদ্ধি খাটানোর কাজ, ভেবেচিন্তে কিছু-একটা করে তোলার কাজ, এগুলোই মগজের আসল কাজ, এরই জোরে মানুষের এতো গুণপনা। এই কাজগুলো হয় মগজের ওপরে সামনের দিকটাতে। মানুষ যা দেখেছে, যা শিখেছে, যা বুঝেছে সেই সব অভিজ্ঞতাই মগজের সামনের দিকের সেলগুলোয় জমা করা থাকে।

তাহলে দেখলাম, মগজের হুকুমেই শরীরটা চলছে।

মগজ কী করে শরীরটা চালাচ্ছে? সে ভারি মজার ব্যাপার, মন দিয়ে শোনো।

মগজ বসে আছে তার দপ্তরে, শরীরের নানান দিক থেকে খবর আসছে। সামনে দেখলাম একটা সাপ, চোখ থেকে খবর পৌঁছলো মগজে। মগজ তখন খবর পাঠালো পাকে, সরে যাও। পা সরে গেলো।

মগজে খবর আসছে, মগজ থেকে খবর যাচ্ছে—কী ভাবে? নার্ভই এই কাজ করছে। একদল নার্ভ খবর বয়ে নিয়ে আসছে মগজে, আর একদল নার্ভ খবর নিয়ে যাচ্ছে মগজ থেকে। কিন্তু নার্ভ কী? নার্ভও এক রকম সেল দিয়ে তৈরি, তাদের চেহারাটা সরু লম্বাটে ধরনের, টেলিগ্রাফের তারের মতো। এগুলো সুতোর মতো একসূত্রে গাঁথা হয়ে সমস্ত শরীরে জাল বিছিয়ে রেখেছে।

এই নার্ভগুলোর সঙ্গে মগজের সম্পর্কটা কিভাবে হয়? শির-দাঁড়ার ভেতরটায় বরাবর একটা পাইপের মতো গর্ত আছে। এর ভেতরে আছে অসংখ্য নার্ভ। ফুলের তোড়ার মতো গোছা বেঁধে। এই গোছাটা উঠেছে শিরদাঁড়ার নিচের থেকে, সেখান থেকে শির-দাঁড়ার পাইপ বেয়ে সোজা উঠে গেছে মগজে। তারপর সেখানে উঠে ছড়িয়ে গেছে মগজের নানান জায়গায়।
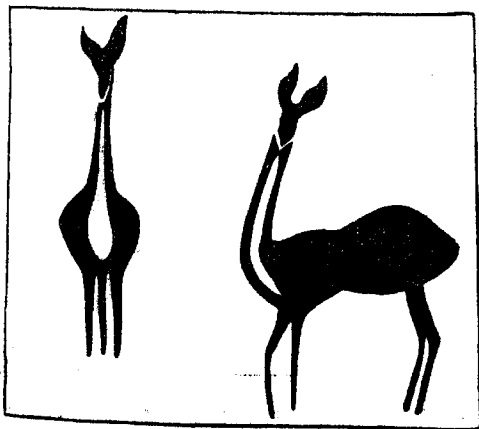
একটা খুদে চিড়িয়াখানা। কোন জানোয়ার কোন পর্বে পড়বে বলতে পারো।

না হয় যে এই উড়ন্ত সরীসৃপরাই আমাদের এখনকার আকাশের পাখিদের পূর্বপুরুষ।

আগেই বলেছি, বহু হাজার বছর ধরে এই সরীসৃপদের এক বংশ ডাইনোসাররা ছিলো পৃথিবীর একাধিপতি। তারপর তাদের হার হলো। কেন, ডারউইনের গল্প বলতে গিয়ে তা বলেছি। তারা বদলে-যাওয়া অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলো না। তাদের একটা দুর্বলতা ছিলো তাদের শরীরের ঠাণ্ডা রক্ত। যাদের শরীরে ঠাণ্ডা রক্ত, বাইরের আবহাওয়ার তাপ বাড়লে-কমলে তাদের শরীরের রক্তের তাপও কমে-বাড়ে। এখন বুঝছো কি, শীতের দিনে সাপ কেন গর্তে গিয়ে ঢোকে? মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ—এরা হলো ঠাণ্ডারক্তের প্রাণী।

যা বলছিলাম—পৃথিবীর আবহাওয়া বদলে গেলো। বলা যায়, গোটা পৃথিবীটাই যেন দার্জিলিঙ বনে গেলো। ডাইনোসাররা তাই হেরে গেলো। জিতলো কারা?

হাতির পাশে মাছি যতো বড়ো, একটা ডাইনোসারের পাশে একটা খরগোশ নিশ্চয়ই তার চেয়ে বড়ো নয়। তবু সেই খরগোসের জাতিই পারলো খামখেয়ালী পৃথিবীর চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে।

এই জাতির গুণের কথা একে একে বলি :

প্রথমত, এদের গায়ের রক্ত গরম। তাই শীতকে এরা ডাইনোসারদের মতো অতো ডরায় না।

দ্বিতীয়ত, এদের শরীর ঘন লোমে ঢাকা। খুব বেশি

ঠাণ্ডা পড়লে লোম খাড়া হয়ে ওঠে, লোম ভেদ করে ঠাণ্ডা বাতাস চামড়ায় গিয়ে পৌঁছতে পারে না।

তৃতীয়ত, এরা ডিম পাড়ে না। ডিম পাড়ার কতো হাঙ্গামা। ডিম কতো রকমে ভেঙে যায়, অন্য কোনো জন্তু খেয়ে ফেলে। অনেক অসুবিধে। তাই তারা ডিম পাড়ে না। তাদেরও ডিম ফুটেই বাচ্চা হয় বটে, কিন্তু বাচ্চা বড়ো হয় মায়ের পেটের ভেতরে। তারপর বেশ একটু বড়োসড়ো হলে বাচ্চা মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে আসে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও মা বাচ্চার দেখাশোনা করে, মায়ের বুকের দুধ খেয়ে (সাধুভাষায় স্তন্যপান করে), বাচ্চা বড়ো হয়। তাই এদের নাম স্তন্যপায়ী। তার মানে, পৃথিবীতে তাদের টিকে থাকার আশা অনেক বেশি।

আর শুধু আশা নয়, সত্যিই তারা আজও টিকে আছে।

স্তন্যপায়ীরা প্রথমে ছিলো ডাঙারই জীব। তারপরে জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র এরা ছড়িয়ে পড়লো। আকাশে উড়লো চামচিকে—তবু ওদের ঘুমোবার জন্যে পৃথিবীতে নেমে আসতে হয়। জলে নামলো হাঙর, সীল—তবু তাদের নিশ্বাস নেবার জন্যে মাঝে মাঝে ডাঙায় উঠে আসতে হয়। কাঠবেড়ালি আশ্রয় নিলো গাছের ডালে। এরাই সবাই স্তন্যপায়ী।

আর ডাঙার স্তন্যপায়ীরা নানান শাখায় বিভক্ত হয়ে গেলো : রকমারি গড়ন তাদের, কতো রকমারি স্বভাব। দাঁতের বৈচিত্র্যে তাদের তিনটি ভাগে ফেলা যায় : (১) শ্বাদন্তী —সিংহ, বাঘ, কুকুর, বেড়াল প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী। তাদের দাঁতগুলো টেনে-ছিঁড়ে মাংস খাবার মতো করে তৈরি। (২) গোরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, শুয়োর প্রভৃতি নিরামিশাষী প্রাণী। তাদের দাঁতগুলো পিষে খাবার মতো করে তৈরি। (৩) ইঁদুর, কাঠবেড়ালি, বীভার, যাদের দাঁত কুট-কুট করে কেটে খাবার জন্যে তৈরি। এদের সামনের দাঁতগুলো সারাজীবন ধরে বেড়ে চলে। আবার ক্রমাগত ব্যবহার হতে হতে ক্ষয়ে যায়। যদি কোনো পোষা কাঠবেড়ালিকে সব জিনিসই ছেঁচে খেতে দেওয়া হয়, তার কী হবে? দাঁতগুলো বড়ো হয়েই চলবে, শেষে একদিন সে আর মুখ খুলতেই পারবে না, না খেয়ে মরবে।

ডারউইনের গল্প শুনতে-শুনতে এই কথাটা আমরা শিখেছি : কোনো শ্রেণীর বা জাতির প্রাণীই পৃথিবীতে আচমকা এসে হাজির হয় নি, আগের ধাপের প্রাণীদের সঙ্গে তাদের একটা যোগাযোগ থাকে। ডারউইন জংশনের প্রাণীদের কথা বলেছিলেন—যাদের দেহে কয়েক ধরনের প্রাণীর অঙ্গ যেন এসে জটলা পাকিয়েছে, তারপর সেখান থেকে একেক প্রাণী একেক রাস্তায় চলে গেছে।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে এমন জংশনের প্রাণী আজও টিকে

আছে। কেন, অস্ট্রেলিয়ায় কেন?

প্রমাণ আছে, বহুদিন আগে এশিয়া আর অস্ট্রেলিয়া একই মহাদেশ ছিলো। তারপর সমুদ্র তাদের আলাদা করে দিয়েছে। যখন একই অস্ট্রেলেশিয়া মহাদেশ ছিলো, তখন নিশ্চয়ই সারা দেশে একই ধরনের প্রাণী ছিলো। এমন প্রাণী নিশ্চয়ই ছিলো যারা সরীসৃপের ধাপ থেকে স্তন্যপায়ী ধাপে উঠে আসছে। তাদের পুরোপুরি স্তন্যপায়ী বলতে পারি না, কারণ তাদের মধ্যে সরীসৃপের লক্ষণ কিছু কিছু থেকেই যাচ্ছে। তাদের বলা যেতে পারে সরীসৃপ-স্তন্যপায়ী প্রাণী।

দু-নৌকায় পা দিয়ে বেশিক্ষণ থাকা যায় না, ডুবতে হয়। অস্ট্রেলিয়া বাদে পৃথিবীর অন্য অংশে বোধহয় সেই জন্যেই এই দু-নৌকোয়-পা-দেওয়া প্রাণীদের চিহ্নমাত্র নেই। উঁচু-ধাপের স্তন্যপায়ীরা তাদের শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় তারা প্রবল শত্রুর তাড়নার থেকে বাঁচতে পেয়ে এখনও পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছে। যেমন, ডাকবিল। বেড়ালের মতো তাদের লোম, কিন্তু ডিম পাড়ে। কিংবা ধরো ক্যাঙারুর কথা। ডিম পাড়ে না ক্যাঙারু, বাচ্চাই পাড়ে। কিন্তু পেটের যে থলিটার মধ্যে বাচ্চা বড়ো হয় সেটা থাকে পেটের বাইরে। সেই থলিটার মধ্যে বাচ্চাটা যখন প্রথম আসে, এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চির বেশি বড়ো হয় না। তখন সে কিচ্ছু দেখতে পায় না। তারপর মাস তিনেক পরে থলির ভেতর থেকে বাচ্চাটা একটু-আধটু উঁকি-ঝুঁকি মারে, মাস কয়েক পরে সে থলির ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু সরীসৃপদের পেটের নিচে যে বিশেষ ধরনের কয়েকটি হাড় দেখা যায়, ক্যাঙারুর শরীরেও সেই জায়গায় সেই রকম হাড় দেখা যায়।

যে যাই হোক, কয়েক লক্ষ বছর ধরে স্তন্যপায়ীরাই পৃথিবীতে রাজত্ব করলো। তাদের কাছে অন্যসব প্রাণীই কাবু। একজনরা বাদে। বাঘ তাড়া করলে সরসর করে মগডালে উঠে তারা কলা দেখায়। হয়তো ভেঙচিও কাটে। এদের নাম প্রাইমেট। এরাও অবশ্য স্তন্যপায়ী।

ভবিষ্যৎ কি এই প্রাইমেটদের হাতে?

জবাব পেতে দেরি হবে না। খিড়কির বাগানের 'সেই আমগাছ' এখান থেকেই দেখা দিচ্ছে। দুটি পাকা ফল আমাদের বরাতেও জুটবে নিশ্চয়ই। একটি ফল আনন্দ, একটি ফল জ্ঞান।

এই গেছো জীবরা প্রথমে হয়তো খুবই ছোটোখাটো ছিলো। ইঁদুরের মতো। শরীরের তুলনায় পা দু-জোড়া বেশ ছোটো। গাছে থাকতে থাকতে পাগুলো মানানসইভাবে বড়ো হয়ে উঠতে লাগলো, গোটা শরীরটাই বড়ো হয়ে উঠতে লাগলো।

ডালে ডালে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করতে-করতে এদের শরীরে খুব বড়ো-বড়ো কয়েকটা পরিবর্তন ঘটে গেলো।

সামনের পা।। গাছে চলাফেরা করতে হলে চারটে পায়ের দরকার পড়ে না, পেছনের দুটো পাই যথেষ্ট।

বেশ, তাতে হলো কী? সামনের পা-জোড়া, নতুন নতুন কাজের ফরমাশ পেলো : জিনিসকে ধরা, হাত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জিনিসকে দেখা, স্পর্শ করা, মুখের মধ্যে খাবার পুরে দেওয়া, ডাল ধরে ঝোলা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব করতে-করতে করতে-করতে সামনের পা-জোড়া আর পা রইলো না, হাতেরই সামিল হয়ে গেলো। আঙুলগুলো লম্বা হলো, হাতের বুড়ো আঙুল হলো, পায়ের বুড়ো আঙুল হলো। আঙুলগুলো ঘোরাতে ফেরাতে বাঁকাতে পারা গেলো। হাত-আর পায়ের তফাত ঘটলো।

চোখ॥ গাছে থাকতে হলে অনেক ভালো করে দেখতে পাওয়া চাই। আর তা সম্ভবও। নজর করে দেখার অভ্যাস হতে-হতে চোখজোড়া আকারে বড়ো হলো। আর কোনো জিনিসকে ভালো করে নজর করা মানে দুচোখ দিয়েই নজর করা। কুকুর ইত্যাদি প্রাণীরা এক চোখ দিয়ে দেখে। জানতে সে-কথা? এরা দুচোখের একসঙ্গে ব্যবহার শিখলো।

মুখ॥ মুখ ছোটো হতে লাগলো। মুখের চোয়াল ছোটো হতে লাগলো। কারণ? কারণ, এখন মুখের কাজ শুধু চিবোনো; গোরুর মতো মুখ বাড়িয়ে খাবার ছিঁড়ে তুলে আনতে হয় না।

আর শেষ কথা—মাথা॥ মাথার চেহারা পালটে গেলো। লম্বা মাথার বদলে গোল মাথা। আর গোল মাথায় বড়ো মগজ।

এই সব অদলবদল যুগের পর যুগ ধরে একটু একটু করে

হতে থেকেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রকৃতি আবার এক চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির। সেই চ্যালেঞ্জ হলো—হিমবাহ। উত্তরের পাহাড় থেকে বিরাট বিরাট বরফের চাঁই হু-হু করে নেমে আসতে লাগলো অতিকায় দৈত্যের মতো। বড়ো বড়ো বন সেই বরফের পাহাড়ের চাপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো।

প্রকৃতি যেন ডেকে বললেন, 'যতো তোমার কেরামতি গাছে গাছে। মাটিতে নেমে কেরামতি দেখাও দেখি'।

এ-চ্যালেঞ্জের জবাব প্রাইমেটরা দিতে পারলো না। বরফের পাহাড় যতোই এগিয়ে আসতে লাগলো ততোই তারা পিছু হটতে লাগলো দক্ষিণে—দক্ষিণে। দক্ষিণের বনে।

প্রাইমেটদেরই একটি বংশ চ্যালেঞ্জের জবাব দিলো। এদের নাম বনমানুষ। দু পায়ে ভর দিয়ে তারা গাছ থেকে নেমে মাটির ওপর দাঁড়ালো। হয়তো কুঁজো হয়ে দাঁড়ালো। হাঁটতে লাগলো। হয়তো আনাড়ির মতো, খোঁড়া মানুষের মতো হাটলো।

তবু দাঁড়ালো। তবু হাঁটতে লাগলো।

বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে যুঝলো। এবং জিতলো।

কিসের জোরে জিতলো? বাঘের মতো নখ নেই, গণ্ডারের মতো খড়্গ নেই, সাপের মতো ফণা নেই। তবু সে সকলের ওপরে। সবাইকে সে বশ করেছে। কিসের জোরে?

মানুষ সবাইয়ের মাথায়
তার মাথার জোরে,
বড়ো মগজের জোরে।

সেই মগজের জোরে সে অনুভব করতে পারে সকলের চেয়ে ভালো, চিন্তা করতে পারে সকলের চেয়ে বেশি।

আর মানুষ সব-কিছু তার হাতের মুঠোর মধ্যে এনেছে,
তার হাতের জোরে,
হাতের মুঠোর জোরে।

সেই হাতের মুঠোর জোরে সে জিনিসকে শক্ত করে ধরতে পারে, জিনিসের ভোল পালটে দিতে পারে। পাথরকে সে তীর বানাতে পারে, মাটিকে হাঁড়ি করে দিতে পারে, লোহাকে লাঙলের ফাল বানাতে পারে, কাঠকে চাকা করে দিতে পারে, তলতা বাঁশকে বাঁশি বানাতে পারে, সাতটি তার দিয়ে সেতার বানাতে পারে।

তাই মানুষ জিতেছে। হারতে-হারতে জিতেছে।

সেই হারজিতের গল্প এই প্রাণের গল্পের চেয়ে আরো মজার।

'দুই বিঘা জমির' উপেনের সাতপুরুষের ভিটে চষে জমিদার শখের বাগান বানিয়েছিলো। কিন্তু মানুষের লক্ষ-লক্ষ বছরের প্রাসাদ ভেঙে দেবে, এমন দম্ভ যদি কোনো জমিদারের থাকে তবে তার দম্ভই চূর্ণ হবে

আর মানুষের কীর্তির প্রাসাদ
দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ
আকাশে মাথা তুলবে